ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১
Fruit and Vegetable Cultivation-1

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৯৪১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. ইমরুল কায়েস

প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন

ড. সৈয়দ নাসির উদ্দিন

ড. মো: সাহিনুল ইসলাম

ড. মোছা আখতার জাহান কাঁকন

মো: কবির হোসেন **(প্যাডাগগ)**

আবদুল্লা আল মাবুদ (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র
(নবম শ্রেণি)

প্রথম অধ্যায়

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশনে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী

(Personal Protective Equipment for Cultivation Fruits&Vegetables)



এই অধ্যায় শেষে -

- চোখকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে সুরক্ষিত রাখার উপায় বলতে পারবে
- ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- হাতকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- পা ও পায়ের পাতাকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- মাথা ও ঘাড়কে সুরক্ষিত রাখতে পারবে

১.১ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী

কিছু বিশেষ পরিধেয় পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণের সমষ্টিগত নাম, যা পরিধানকারীকে ঝুঁকি, বিপদ বা রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। যেমন রাসায়নিক দ্রব্যাদি হাতে ধরার সময় হাতে গ্লাভস

পরা উচিত। প্রতিটি শ্রমিক বা কর্মচারী, যার পেশাগত কর্ম সম্পাদনের সময় ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা আছে, তার কাছে অবশ্যই ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী থাকা অত্যাবশ্যক। বালাইনাশক মেশানো, বালাইনাশকের খালি প্যাকসমূহকে পরিষ্কার করা, বালাইনাশক স্প্রে করা ও বালাইনাশক স্প্রে করার উপকরণ পরিষ্কারের সময় কি পরতে হবে সে সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য আপনার বালাইনাশককের লেবেলটি ভালভাবে পড়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বালাইনাশককের বোতল বা প্যাকেটের গায়ে বিবৃত থাকে কমপক্ষে সেই পিপিই পরে থাকা উচিত।

১.২ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর তালিকা

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন বইয়ের সকল ব্যবহারিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যাবহার করা প্রয়োজন-

১। সুরক্ষা চশমা

২। ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ

৩। বায়ু-পরিশোধনকারী রেসপিরেটর

৪। হাত মোজা /গ্লাভস

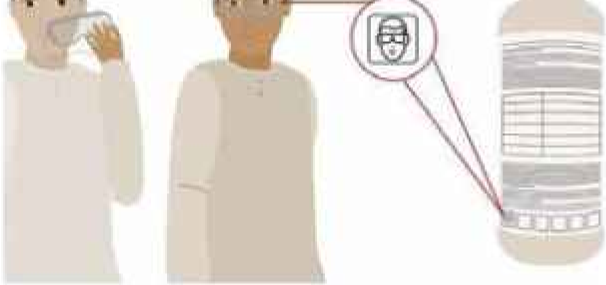
৫। সর্বাঙ্গ ঢাকা পোশাক বা ট্রাউজার

৬। রাবারের বুটজুতা বা গামবুট

৭। টুপি বা হুড

১.৩ চোখকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

চোখকে ছিটে, স্প্রে-এর ফোঁটা এবং ধুলো থেকে সুরক্ষিত রাখতে সুরক্ষা চশমা পরতে হবে। শুধুমাত্র বালাইনাশক নিয়ে কাজ করার সময়ই এই সুরক্ষা চশমাগুলি ব্যবহার করুন। একই সুরক্ষা চশমা অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না। সুরক্ষা চশমাগুলোকে অবশ্যই সুরক্ষিতভাবে, রোদ ও ধুলো থেকে দূরে রাখা উচিত এবং ভালো হয় একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগে যদি রাখা হয়।

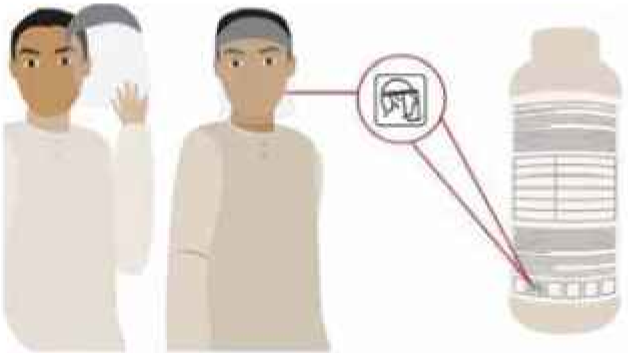


চিত্র: সুরক্ষা চশমা

২০২৫

১.৪ মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে সুরক্ষিত রাখতে করনীয়

মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে বালাইনাশক ছিটে বা বড় ফোঁটা থেকে সুরক্ষিত রাখতে একটি মুখের আবরণ পরতে হবে। বালাইনাশক মেশানোর সময় একটি মুখের আবরণ এবং সুরক্ষা চশমা পরে নিতে হবে। মুখের আবরণ বাষ্প, ধোঁয়া বা কুয়াশা থেকে সুরক্ষিত করতে পারবে। ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি রেসপিরেটর ব্যবহার করতে হবে। যেখানে চোখের বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন হবে সেখানে সুরক্ষা চশমা ব্যবহার করতে হবে। কিছু বালাইনাশকের লেবেলে ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ পরার কথা বলা হয়ে থাকে।



চিত্র: ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ

১.৫ ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

একটি আবদ্ধ জায়গাতে বা বাতাস নিজের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় স্প্রে করলে বালাইনাশকের স্প্রে শ্বাসে চলে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। স্প্রে হল তরলের ফোঁটাসমূহ যা বাতাসের মধ্য দিয়ে গতিশীল হতে পারে। সেগুলো খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে ছোট কণা তৈরি করতে পারে, যা খুব সহজেই শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। একটি রেসপিরেটর ব্যবহারের মাধ্যমে ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখা যায়। রেসপিরেটর ব্যবহারের জন্য কোন রেসপিরেটরটি সঠিক হবে সে ব্যাপারে বালাইনাশকের লেবেলটি দেখে নিতে হবে এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।



চিত্র: বায়ু পরিশোধনকারী রেসপিরেটর

১.৬ হাতকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

শরীরের মধ্যে হাত ও কবজিই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বালাইনাশকগুলির সংস্পর্শে আসে। বালাইনাশকের প্যাক খোলা, অদ্রবীভূত পণ্য পরিমাপ করা এবং স্প্রেয়ার ব্যবহার করার সময় হাত ব্যবহার করতে হবে, যেখানে লীক হওয়া বা চুঁইয়ে পড়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

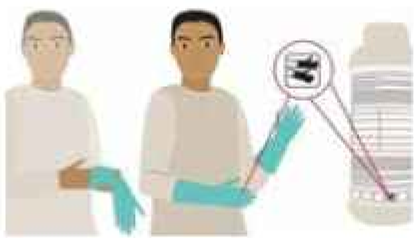
১.৬.১ হাত ও কবজিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য গ্লাভস ব্যাবহার করা

১। বালাইনাশক মেশানোর সময়

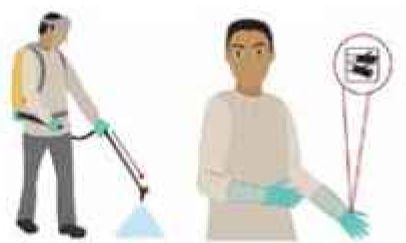
২। বালাইনাশক স্প্রে করার সময়

৩। উপকরণ পরিষ্কার করার সময়

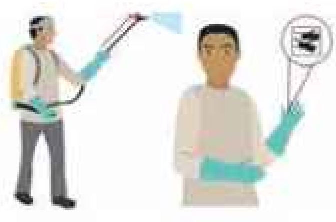
হাতমোজা পরার আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং হাতমোজাগুলো খোলার আগে সেগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।



চিত্র: হাত মোজা বা গ্লাভস



চিত্র: বালাইনাশক নিচে স্প্রে করার পদ্ধতি

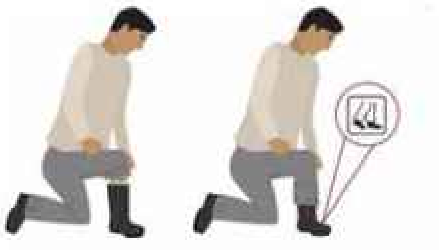


চিত্র: বালাইনাশক উপরের দিকে স্প্রে করার পদ্ধতি

২০২৫

১.৭ পা ও পায়ের পাতাকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

নীচের দিকে বালাইনাশক স্প্রে করার সময় এবং স্প্রে করা পাতাগুলির সংস্পর্শে থাকার সময় পা ও পায়ের পাতাকে বালাইনাশকের ছিটে থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক বা ট্রাউজার ও রবারের বুটজুতা পরতে হবে। বুটজুতাগুলো ভিতর ও বাইরের দিক থেকে পরিষ্কার এবং ভাল অবস্থায় আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে । সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক/ট্রাউজারের পায়ের অংশগুলিকে বুটজুতার বাইরের দিকে রাখতে হবে, যাতে স্প্রে গড়িয়ে বুটজুতার ভিতরে চলে না যায়। খুলে ফেলার আগে অবশ্যই বুটজুতাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্র: বুটজুতার ব্যবহার

১.৮ শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

পিপিই ব্যবহারের সময় কাজের পোষাকের উপর পরা উচিত যাতে দুই স্তর জামা পরা অবস্থায় থাকা যায়। শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে সঠিক পিপিই পরতে হবে যাতে:

১। বালাইনাশক মেশানো ও ব্যবহারের সময় ত্বককে ছিটে ও ছলকে পরা থেকে সুরক্ষিত রাখা যায়

২। পিঠ ও হাতকে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার থেকে ও বালাইনাশক লীক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

১.৯ মাথা ও ঘাড়কে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

উপরের দিকে স্প্রে করার সময় এবং স্প্রে করা পাতাগুলির সংস্পর্শে থাকার সময় উপর থেকে বালাইনাশকের পড়ন্ত ফোঁটাগুলো থেকে মাথাকে সুরক্ষিত রাখতে টুপি বা হুড পরতে হবে।

১.৯.১ টুপি বা হুড পরার নিয়ম

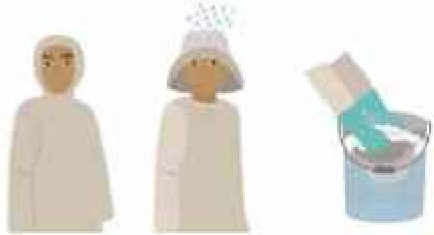
১। টুপি বা হুড পরার সময় বা খুলে ফেলার সময় পরিষ্কার হাতমোজা বা হাত ব্যবহার করতে হবে।

২। টুপি পরার সময় লম্বা চুল পিছনে বেঁধে নিতে হবে এবং ঢেকে দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, টুপি যাতে মাথাতে আটকে থাকে।

৩। যদি একটি হুড যুক্ত কভার-অল বা সর্বাঙ্গ-ঢাকা পোষাক পরা থাকে, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যে, চুল যাতে হুডের ভিতরে আটকে থাকে।

৪। যদি সুরক্ষা চশমা পরা থাকে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, টুপিটি যাতে সুরক্ষা চশমা ও ত্বকের মধ্যে থাকা সীলটিকে ভেঙ্গে না দেয়।

৫। অবশ্যই টুপিটিকে শুধুমাত্র বালাইনাশকের সাথে ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে



চিত্রঃ টুপি বা হুডের ব্যবহার

নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সকলকে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী ব্যাবহার করতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রীর সীমাবদ্ধতা, কী করে সামগ্রীর প্রতিটি উপাদানকে রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে হবে এবং অকেজো হয়ে গেলে সামগ্রীটিকে কীভাবে বর্জন করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। চোখকে ছিটে, স্প্রে-এর ফোঁটা এবং ধুলো থেকে সুরক্ষিত রাখতে সুরক্ষা চশমা পরতে হবে

২। হাত ও কবজিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করতে

৩। বালাইনাশক স্প্রে করার সময় পা ও পায়ের পাতাকে বালাইনাশকের ছিটে থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক, ট্রাউজার ও রবারের বুটজুতা পরতে হবে

৪। বালাইনাশক উপরের দিকে স্প্রে করার সময় মাথাকে সুরক্ষিত রাখতে টুপি বা হুড পরতে হবে

এসো নিজে করি নিচের ছবিগুলো দেখে পিপিইর নাম লিখ এবং তাদের ব্যবহার উল্লেখ কর।

নাম	ছবি	ব্যবহার
		
		
		
		

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সুরক্ষা চশমার কাজ কী?

২। হ্যান্ড গ্লাভস এর কাজ কী?

৩। গাম্বুট কেন ব্যবহার করা হয়?

৪। টুপি বা হুড কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। হাত ও কবজিকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়।

২। ফুসফুসকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়।

৩। কিভাবে শরীরকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

২০২৫

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বলতে কি বুঝ? ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর তালিকা প্রদান কর।

২। ব্যক্তিগত সুরক্ষা হিসেবে টুপি বা হুড পরার নিয়ম আলোচনা কর।

জব ১: পিপিই পরিধান করার নিয়ম

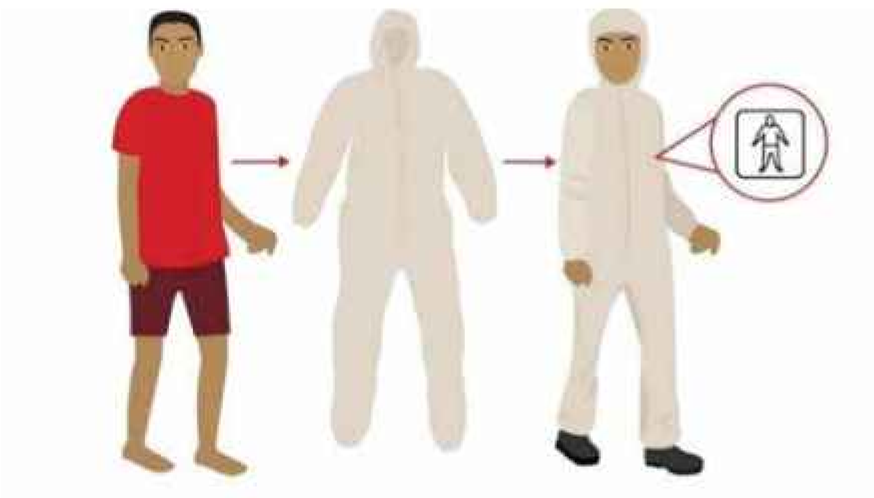
১। কাজের পোশাকের উপর পিপিই-টি পরে নিতে হবে। পিপিই-টিকে ঘাড়ে আটকে নিতে হবে।

২। পিপিই-র পায়জামার পা গুলোকে বুটজুতার বাইরে পরে নিতে হবে, যাতে বালাইনাশক গড়িয়ে বুটজুতার ভিতরে ঢুকে না যায়।

৩। নীচের দিকে বা সমান্তরালভাবে স্প্রে করার সময় হাতমোজাগুলিকে জামার ভিতরে গুঁজে নিতে হবে।

৪। উপরের দিকে ও সমান্তরালভাবে স্প্রে করার সময় জামার হাতাকে দস্তানার ভিতরে গুঁজে নিতে হবে।

৫। যদি উপরের দিকে ও সমান্তরালভাবে স্প্রে করেন, হাতা ও দস্তানার জোড়ায় টেপ লাগিয়ে আটকে দিতে হবে।



চিত্র: পিপিই পরিধান করার নিয়ম

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাকসবজির চারা উৎপাদন

(Seedling Production of Vegetables)




কিছু কিছু সবজি আছে, যা সরাসরি মুল জমিতে রোপণ করা যায় না। প্রথমে বীজতলায় বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যেমে চারা তৈরী করে নেয়া হয়। পরবর্তিতে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। বেগুন, মরিচ, ফুলকপি, বাধাকপিসহ আরো অনেক সবজির চারা বীজতলায় তৈরী করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরী করা হয়।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন প্রকার সুস্থ সবল শাকসবজির চারা চিহ্নিত করতে পারবে
- বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের হার, বীজতলা তৈরি ও বীজতলায় বীজ বপন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- বীজতলায় চারার অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে
- চারা উত্তোলনের সঠিক সময় ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারবে
- সবজির উৎপাদনে অঙ্গজ বংশবিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে
- সবজির বীজ হার নির্ণয় ও আধুনিক বীজতলা হাতে কলমে তৈরি করতে পারবে

২.১ শাকসবজির পরিচিতি ও ব্যবহার

২.১.১ শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

শাকসবজি এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যান ফসল। পৃথিবীতে প্রায় ৮০টি পরিবারের ১২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ শাকসবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্ধেকের বেশি প্রজাতির শাকসবজি বনে-জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মে, সেগুলো চাষ করা হয় না, তবে খাওয়া হয়। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত ৯৮টি শাকসবজি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে

যেগুলো এ দেশেই জন্মে। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শাকসবজি খেতে হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন অন্তত ৩০০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া দরকার। কিন্তু এদেশে যে পরিমাণ শাকসবজি উৎপন্ন হয় তাতে আমাদের চাহিদার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ পূরণ হয়। সীমিত জমিতে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে হলে সঠিক চাষ পরিকল্পনা ও চাষাবাদের আধুনিক নিয়ম বা প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শাকসবজির উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই।

শাকসবজি এক ধরনের ফসল যা সাধারণত একবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় গাছ, যা কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া হয়। যেসব ফসলের আমরা পাতা খাই, সেগুলোকে বলে 'শাক', যেমন- পুঁইশাক, লালশাক, গিমাকলমি ইত্যাদি। আর যেসব ফসলের অন্যান্য অংশ (ফল, ফুল, বীজ) খাই সেটা হলো 'সবজি', যেমন- ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদি। এই দুইয়ে মিলে হলো, 'শাকসবজি'। যেসব সবজি আমরা রান্না না করে কাঁচা খাই, সেগুলোকে বলে 'সালাদ' ফসল। শাকসবজি গুল্ম, বিরুৎ অথবা বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের অংশও হতে পারে।

কৃষি বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে উদ্যানতত্ত্ব যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Horticulture.

উদ্যানতত্ত্ব হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে উদ্যান বা বাগানে বিশেষ যত্ন সহকারে চাষকৃত উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত যেগুলো মানবজাতি কর্তৃক খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে এবং মনোরঞ্জনের জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী এগুলো ফল, সবজি, মসলা, ফুল ও ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সবজিবিজ্ঞান (Olericulture): উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় শাক-সবজির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গঠন, বংশবিস্তার, আবহাওয়া ও মাটির প্রভাব, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সবজি বিজ্ঞান বলা হয়। দুটি গ্রীক শব্দ Oleris অর্থ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ এবং culture অর্থ চাষাবাদ মিলে Olericulture শব্দটি এসেছে।

ব্যবহারের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন শ্রেণির শাকসবজিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১) ভক্ষণীয় অংশভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

ক) পাতা জাতীয় শাকসবজি: লালশাক, পালংশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক, বাঁধাকপি, পুদিনা পাতা, লেটুস, কচু শাক, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।

খ) কান্ডজাতীয় সবজি: ডাটা, ওলকপি।

গ) ফুল জাতীয়: ব্রোকলি, ফুলকপি, বকফুল।

ঘ) ফলজাতীয়: বেগুন, টমেটো, মরিচ, ঢেঁড়শ, পেঁপে, লাউ।

ঙ) মূলজাতীয়: মিষ্টি আলু, গাজর।

চ) বীজ জাতীয়: মটরশুটি, শিম।

২০২৫

২) মৌসুম ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ-

ক) রবি মৌসুম/শীতকালীন শাকসবজি

- টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি, শালগম, লেটুস, চায়না কপি, মূলা, পালংশাক, গাজর, শিম, আলু, লাউ ইত্যাদি।

খ) খরিপ মৌসুম/গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি

- ডাঁটা, পুঁইশাক, কুমড়া পরিবারের সবজি, বরবটি, পানি কচু, মুখীকচু, কলমিশাক ইত্যাদি।

গ) উভয় মৌসুম/বারমাসি শাকসবজি

- লালশাক, বেগুন, ঢেঁড়শ, শসা, মরিচ ইত্যাদি।

৩। জীবনকাল ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

বীজ বপনের পর হতে নতুন বীজ পাওয়া পর্যন্ত সময়ের উপর ভিত্তি করে সবজির শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন-

ক) একবর্ষজীবী সবজি: এসব সবজির জীবনচক্র ১ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন- টমেটো, বেগুন, মরিচ, ঢেড়স, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি।

খ) দ্বিবর্ষজীবী সবজি: এসব সবজির জীবন চক্র ২ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন- বাঁধাকপি, গাজর ইত্যাদি। এমন কিছু সবজি আছে যেগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় হিমাবেশন না পেলে ফুল ধারণ করতে পারে না। শীতপ্রধান অঞ্চলে এদের বীজ উৎপাদন করতে হলে দুটি মৌসুম লাগে। প্রথম গ্রীষ্মে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি, তারপর শীতে হিমাবেশন এবং দ্বিতীয় গ্রীষ্মে ফুল ও বীজ উৎপাদিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এসব উদ্ভিদের অধিকাংশ জাত বীজ ধারণ করতে পারে না। ঐসব দেশে বছরে একটি মাত্র সবজি উৎপাদন মৌসুম আছে এবং তা হলো গ্রীষ্মকাল। এজন্য এ জাতীয় সবজিকে দ্বিবর্ষজীবী বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে একটানা দুবছর লাগে না।

গ) বহুবর্ষজীবী সবজি: এসব সবজির ২ মৌসুমের অধিক ভূ-উপরস্থ অংশ থেকে ফলন পাওয়া যায়। যেমন- শতমূলী (Asparagus), পেঁয়াজ, লীক, সজিনা ইত্যাদি।

২০২৫

৪। কান্ডের প্রকৃতি ও বিস্তৃতিভিত্তিক

ক) বীরুৎ জাতীয় সবজি: এ শ্রেণির কান্ড রসাল এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আংশিক কাষ্ঠল হয়। যেমন- আলু, চালকুমড়া।

খ) গুল্ম জাতীয় সবজি: এ ধরনের সবজি কাষ্ঠল প্রকৃতির, কিন্তু সুস্পষ্ট একক কান্ডহীন। গোড়া থেকে অধিক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ঝোপে পরিণত হয়। যেমন- শতমূলী (Asparagus), বেগুন।

গ) বৃক্ষ জাতীয় সবজি: একক কান্ড বিশিষ্ট বৃহৎ কাষ্ঠল উদ্ভিদ। যেমন- সজিনা, বকফুল।

৫। উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ

ক) একবীজপত্রী সবজি: যেমন- মানকচু, পানিকচু, মুখিকচু, মৌলভি কচু, মেটে আলু, গাছ আলু, পেঁয়াজ, রসুন, অ্যাসপ্যারাগাস ইত্যাদি।

খ) দ্বিবীজপত্রী সবজি: লালশাক, ডাঁটা, পুঁইশাক, পালংশাক, বীট, লেটুস, কলমিশাক, মিষ্টিআলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, লাউ, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, ঢেঁড়শ, বেগুন, মরিচ, গাজর, আলু ইত্যাদি।

২.১.২ শাকসবজি চাষের গুরুত্ব

দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখতে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। শারীরিক সুস্থতার জন্য অন্যান্য খাদ্যের পাশাপাশি শাকসবজি খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ শাকসবজিতে খাদ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে। শাকসবজির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে সহজেই ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্থ সবল জনসম্পদ সৃষ্টি করার পাশাপাশি দানাদার খাদ্যের উপরে চাপ কমানো যায়। বাংলাদেশে আলুসহ প্রায় ১৫৬ প্রজাতির শাক-সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রায় সারা বছরই ২০-২৫ জাতের সবজি উৎপাদিত হয়। রবি বা শীত মৌসুমে অধিকাংশ সবজি চাষের অনুকূলে হওয়ায় মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০% সবজি এ মৌসুমে হয়। বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় বড় অংশ দখল করে আছে দানাজাতীয় খাদ্য (চাল, গম, ভুট্টা)। যেমন- মাথাপিছু দৈনিক গড়ে যেখানে দানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমান ৪৫৪-৫২৮ গ্রাম, সেখানে শাক-সবজিসহ মুল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমান ১৬৬ গ্রাম, যা উদ্ভিদ খাদ্যের মাত্র ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে আলু ও মূলজাতীয় সবজি বাদ দিলে শাকসবজির পরিমান দাঁড়ায় মাত্র ৩০-৩৫ গ্রামের মতো, অথচ প্রয়োজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত সেই কৃষি পেশারই প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়াও অন্যান্য পেশাসহ প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার শিকার। আমাদের দেশে প্রায় দেড় কোটি বসতবাড়ির আওতায় প্রায় ৫ ভাগ জমি রয়েছে। বসতবাড়ির আঙ্গিনার এসব জমি সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাড়তি আয় করা ও শাকসবজির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর তথ্যমতে, বিগত ১২ বছরে সবজি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭ গুন। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, চীন ১ম ও ভারত ২য় অবস্থানে রয়েছে। কৃষি হচ্ছে আমাদের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত, এ খাত থেকে জিডিপির ১৩.২৯ শতাংশ আসে।

শাকসবজি চাষের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান নিশ্চিত করা যায়।

খ) অর্থনৈতিকভাবে সবজি চাষ করে মাঠ ফসলের তুলনায় বেশি লাভ করা যায়।

গ) খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা যায়।

ঘ) পতিত জমির সদ্ব্যবহার করা যায়।

ঙ) রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

চ) শাকসবজিভিত্তিক শিল্প (Agrobased Industry) সৃষ্টি করা যায়।

২.১.৩ শাকসবজি উৎপাদনে সমস্যাসমূহ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, প্রতিদিন একজন সুস্থ সবল মানুষের ৩০০ গ্রাম সবজি গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু দেশে মাথাপিছু সবজি সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে মাত্র ৭০ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ সবজি বিভিন্নভাবে অপচয় হয়ে থাকে। এছাড়া সবজির ব্যবহারও খুব সীমিত। ফলে সবজি গ্রহণে আমরা একেবারেই পিছিয়ে আছি। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতা অর্জন করলেও গ্রহণের দিক থেকে একেবারেই নিচের সারিতে অবস্থান করছে। মাথাপিছু চাহিদা অনুযায়ী সবজি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন ব্যবস্থা নানা কারণে সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। ত্রুটিপুর্ণ চাষাবাদ: ভাল ফলন ও উৎকৃষ্ট মানের পণ্য পাওয়ার জন্য কতকগুলো নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের কৃষকরা অনেক সময় এগুলো জেনেও না জানার ভান করে থাকেন। অথবা উদ্যোগী ভূমিকা নেন না।

২। জলবায়ুর পরিবর্তন: সাধারণত নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এ সময় ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করে বিধায় এই সময়ে শীতকালীন সবজি আবাদ হয়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এ সময় থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি বাদলা বাড়তে থাকে। যা অনেক সময় ফসলের ভীষণ ক্ষতি করে। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের অভাব, বর্ষাকালে অত্যাধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে স্বল্প ঠান্ডা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের জন্য প্রধান অন্তরায়।

৩। উপকরণের অপ্রতুলতা: বীজ, সার ও কীটনাশকের সঠিক সময়ে প্রাপ্যতা, উচ্চ মূল্য, গুণাগুণ ইত্যাদি সবজি চাষকে ব্যাহত করে।

৪। সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভাব: বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বিএডিসি ও ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার অভাব আছে। এ জন্য কৃষকরা সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক হাতে পায় না। আর এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে কৃষি উন্নয়নে।

৫। আর্থ-সামাজিক সমস্যা: জমি কম বলে এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। সবজি ফসল উৎপাদনের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। ফলে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ হলেও উৎপাদন বাড়ছে না।অধিকাংশ সবজি পচনশীল, কিন্তু কার্যকর কোন হিমাগার ব্যবস্থা নেই।আবার বাজারজাতকরণও পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিপণনের সমস্যাকে প্রকট করে রেখেছে। ফলশ্রুতিতে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় না। কৃষিজাত পণ্য চাহিদার তুলনায় উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

৬। অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বালাই দমন: সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন না করে অধিক হারে কীটনাশক ব্যবহার করে কৃষকরা পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করছে ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ডেকে আনছে ভয়াবহ বিপদ। ফলে ফলন অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পাচ্ছে।

২.২ বীজ সংগ্রহ ও আদর্শ বীজতলা প্রস্তুত

২.২.১ বীজের সংজ্ঞা

ফুলের পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হবার পর পরিপক্ক ডিম্বককে (ধান, গম, পেঁপে বীজ ইত্যাদি) অথবা গাছের যে অংশ (পটল, পেঁয়াজ, কচু, আলু) বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই বীজ বলে।



চিত্র: বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ

বীজ প্রধানত দু'প্রকার, যথা: ক) যৌন বীজ ও খ) অংগজ বীজ

ক) যৌন বীজ: পরিপক্ক ও নিষিক্ত ডিম্বককে যৌন বীজ বলে। যেমন: ধান, গম (স্বপরাগায়ন), পেঁপে বীজ (পরপরাগায়ন) ইত্যাদি।

খ) অংগজ বীজ: গাছের যে কোন অংশ বিশেষ যা একই রকম গাছের বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাকে অংগজ বীজ বলে। যেমন: আলুর টিউবার, মিষ্টি আলুর লতা, কলার সাকার, কুলের কুঁড়ি/ চোখ, পাথরকুচির পাতা ইত্যাদি।

২.২.২ ভাল সবজি বীজের বৈশিষ্ট্য/গুণাগুণ

১। বাহ্যিক বিশুদ্ধতা: বীজে ধুলো-বালি, আবর্জনা, আগাছার বীজ, অন্য ফসলের ওজাতের বীজের উপস্থিতি দ্বারা বিশুদ্ধতা মাপা হয়। উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবকস্থা গ্রহণ করে বীজের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা যায়।

২। রোগমুক্ততা: ফসলের অনেক রোগই বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। এগুলোর অধিকাংশই ছত্রাকঘটিত রোগ এবং কিছু সংখ্যক ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা ও কৃমিজনিত। রোগের জীবাণু বীজের ত্বকের উপরে বা ভিতরে থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত বীজ থেকে ভাল, সুস্থ, সবল চারা আশা করা যায় না। তাই, বীজ রোগমুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩। সজীবতা (Viability) ও তেজ (Vigority): সজীবতা দ্বারা বীজের অংকুরোদগম যোগ্যতা এবং তেজ দ্বারা অংকুরণ ক্ষমতার মাত্রা বুঝানো হয়েছে। ভাল বীজের ক্ষেত্রে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ হতে হবে।

৪। কৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা: জাতের গুণাগুণ ফসলের বীজের মান নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি। ভাল জাতের না হলে অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও বীজ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। যেসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা জাতের উৎকৃষ্টতা নির্ণয় করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ফলনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থানীয় জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্যতা ইত্যাদি।

ভাল বীজের উৎস

১। বিএডিসি-র বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং ডিলারদের নিকট পাওয়া যাবে।

২। বিশ্বস্ত কোম্পানি/ডিলার ও প্রতিষ্ঠিত দোকানে পাওয়া যাবে।

ভাল বীজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য

১। বেশি ফলন পাওয়ার জন্য।

২। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হবে।

৩। বীজ কম লাগবে, ফলে বীজ বাবদ খরচ কম হবে।

৪। ভাল বীজ ব্যয়বহুল নয়, বরং আয়ের উৎস।

বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা (Purity test): একটি বীজলট বা বীজের প্যাকেটে নির্দিষ্ট ফসলের শতকরা কতভাগ বীজ আছে সেটাই লটের বীজের বিশুদ্ধতা। পরীক্ষায় নমুনা বীজকে বিশুদ্ধ বীজ, অন্য ফসল বীজ, আগাছা বীজ এবং জড় পদার্থ এ চার ভাগে ভাগ করা হয়। পরে বিশুদ্ধ বীজ ওজন করে নমুনার ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বীজ বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট ফসলের বীজকে বিশুদ্ধ বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান বিভিন্নতা, যেমন- ভিন্ন রং, ভিন্ন আকার ইত্যাদি থাকলে তার পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

$$\textbf{বীজের বিশুদ্ধতার হার} = \frac{\text{মোট বীজের পরিমাণ - অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিমাণ}}{\text{১০০}} \times \text{১০০}$$

(Purity Percentage)

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা (Germination Test): সুস্থ সবল চারা উৎপাদনক্ষম বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হারকে অংকুরোদগম ক্ষমতা বলে। পেট্রিডিস বা মাটির পাত্র বা কলার খোল বা ভেজা চটে নির্দিষ্ট নিয়মে চারা গজিয়ে সুস্থ চারা গণনা করে এ হার নির্ণয় করা হয়।



চিত্র: মাটির পাত্রে বীজ গজানো পদ্ধতি



চিত্র: কলার খোলে বীজ গজানো পদ্ধতি



চিত্র: ভেজা চটে বীজ গজানো পদ্ধতি

চিত্র: বিভিন্ন উপায়ে অংকুরোদগম পরীক্ষা

$$\textbf{অংকুরোদগমের শতকরা হার} = \frac{\text{মোট গজানো বীজের সংখ্যা}}{\text{গজানোর জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \times \text{১০০}$$

$$\textbf{বীজের প্রকৃত মান} = \frac{\text{বীজ বিশুদ্ধতা হার} \times \text{বীজ অংকুরোদগম হার}}{\text{১০০}} \%$$

(Seed standard)

একটি বীজ লটের বীজ বিশুদ্ধতা ৯৫% এবং অংকুরোদগম হার ৮৫% । ঐ বীজ লটের প্রকৃত মান নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে বের করা যায়-

$$\textbf{বীজের প্রকৃত মান} = \frac{৯৫ \times ৮৫}{১০০}\ \%$$

$$= \frac{৮০৭৫}{১০০} = ৮০.৭৫\%$$

বীজ হার: কোন নির্দিষ্ট একক পরিমান জমিতে সার্থকভাবে ফসল জন্মানোর জন্য যে পরিমান বীজ বপন করতে হয় তাকে বীজ হার বলে।
বীজ হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

$$\textbf{হে: প্রতি বীজ হার (Seed rate)} = \frac{\text{হেক্টর প্রতি কাংখিত গাছের সংখ্যা} \times \text{প্রতি বীজের গড় ওজন (গ্রাম)}}{\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার} \times \text{অংকুরোদগম হার} \times \text{জমিতে বপনের পর বীজের সম্ভাব্য অংকুরোদগমের হার}}$$

উপরোক্ত পদ্ধতিটি রোপণ পদ্ধতির বেলায় প্রযোজ্য। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে রোপণের বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে সবজির বীজ হার পাওয়া যাবে। আবার সারির বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে ছিটিয়ে বপনের বীজ হার পাওয়া যাবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যাবে। ধরা যাক, বেগুনের সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি। একটি বীজের জন্য প্রয়োজনীয় যায়গা ৭৫ X ২৫ বর্গ সে.মি. = ০.১৮৭৫ বর্গমিটার।

$$\text{সুতরাং, হেক্টরপ্রতি বীজের সংখ্যা} = \frac{১ \times ১০০০০}{০.১৮৭৫} = ৫৩৩৩৩.৩৩\text{টি}$$

হেক্টরপ্রতি বেগুনের কাংখিত গাছের সংখ্যা ৫৩৩৩৩.৩৩টি। এখন অন্যান্য মান বীজ হার নির্ণয়ের সূত্রে বসিয়ে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে।

২.২.৩ বীজতলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

যে স্থানের মাটিকে বিশেষভাবে কর্ষণ করে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে সমতল করে এবং সার প্রয়োগ করে করে সুস্থ চারা তৈরির জন্য সুস্থ ভালো বীজ বপন করা হয় সেই স্থানকে বীজতলা বলে।

সবজি বীজতলার প্রকারভেদ: বীজতলা তৈরির ধরণ অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা ও

২। স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা।

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে স্থানান্তরযোগ্য বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, মাটি, কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি বাক্স, পাত্র বা ট্রে অথবা পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদিতে মাটি ও সার প্রয়োজন অনুপাতে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করাকে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা বলে। নিচে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলার ছবি প্রদান করা হলো-



চিত্র: বিভিন্ন স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা

২। স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: সরাসরি ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বীজতলা তৈরি করা হয় তাকে স্থায়ী বা অস্থানান্তর যোগ্য বীজতলা বলে।



চিত্র: স্থায়ী বীজতলা

২.২.৩ বীজতলার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

বীজতলায় ভালো চারা উৎপন্ন করার জন্য বীজতলার জন্য সঠিক জায়গা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।

বীজতলার স্থান নির্বাচনে যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো হল:

১। খেয়াল রাখতে হবে বীজতলার জন্য নির্দিষ্ট জমি যেন খামার, অফিস বা বাসগৃহের কাছাকাছি হয় যাতে সঠিকভাবে দেখাশোনা করা যায়।

২। বৃষ্টির পানি জমে না এবং বন্যার পানি উঠে না এমন ধরনের উঁচু জমিতে বীজতলা করতে হবে।

৩। বাতাস চলাচল করে এবং রৌদ্রময় জায়গায় বীজতলা করতে হবে।

৪। প্রয়োজন মত চারায় সেচ দেয়ার সুবিধার্থে পুকুর পাড়ে অথবা পানির উৎসের কাছাকাছি জায়গায় ২০২৫

বীজতলা করতে হবে।

৫। উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটি বীজতলার জন্য উপযোগী। বেলেমাটি বেশি হলে কাদামাটি, গোবর বা কম্পোস্ট মিশিয়ে অথবা অতিরিক্ত কাদামাটি হলে বালু, কম্পোস্ট বা গোবর মিশিয়ে মাটির জল ধারণ ও নিষ্কাশনের উপযোগী করে বীজতলার মাটি উন্নত করতে হবে।

৬। বীজতলা রাস্তার পাশে হতে হবে যেন সহজে যাতায়াত করা যায়।

৭। কাদামাটিতে বীজতলা করা যাবে না কারণ কাদামাটিতে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে না এবং পানি সরে না।

২.২.৪ সবজির বীজ সংগ্রহ

ভাল চারা উৎপাদনের প্রথম শর্ত হলো ভাল বীজ। বীজ যত নিরাপদ ও উন্নত হবে চারা ততো ভালো মানের হবে এবং সবজির ফলনও বাড়বে। টেকসই ফসল উৎপাদনে গুণগত সবজির মানসম্পন্ন বীজ ও ভালো জাতের চারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু গুণগত মানসম্পন্ন বীজই কেবল শতকরা ২০-৩০ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বিশ্বস্ত ও প্রকৃত বীজ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাহিদা মাফিক সঠিক জাতের সবজি বীজ ক্রয় বা সংগ্রহ করতে হবে। জাত নির্বাচন ও বীজ ক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী অথবা একজন আদর্শ কৃষকের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। প্যাকেটের গায়ে বীজের গুণগত মানের কতগুলো তথ্যাদিসহ ওই বীজের মেয়াদ উত্তির্ণের তারিখ স্পষ্ট করে লেখা আছে এমন বীজের প্যাকেট কিনতে হবে।

২.২.৫ বীজ শোধন

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা হলো বীজ শোধন। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। তাই বীজ শোধন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার। বীজের বহিরাবরণে ও ভেতরেও রোগ জীবাণু থাকে, যা বীজের গজানোতে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাই বীজ শোধন করে নিলে তাড়াতাড়ি বীজ গজায় এবং ফসলের ফলনও বেশি হয়। বীজতলায় বপনের পূর্বে সবজি বীজ কয়েকটি পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। যেমন- এগুলোর মধ্যে গুঁড়া রাসায়নিক ওষুধ দ্বারা বীজ শোধন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ও কম ঝামেলাপূর্ণ। বীজ রোপণের প্রায় ১ মাস পূর্বে রাসায়নিক পদ্ধতি বীজ শোধন করে রাখলে বীজ বেশি ভাল থাকে। পালংশাক, কপিজাতীয় সবজি, ঢেঁড়শ, মরিচ ইত্যাদি প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স এবং কুমড়াজাতীয় সবজি, গাজর, লেটুস ইত্যাদি সবজির প্রতি কেজি বীজে ১.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স ও মুলা, শালগম, বীট এ ২.০ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা যায়। বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির অ্যানথ্রাকনোজ, পাতায় দাগ, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়। বীজ শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষাক্ত বিধায় শোধিত বীজ, শোধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২০২৫

২.২.৬ আদর্শ বীজতলা প্রস্তুতকরণ

একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে বীজ বপনের কয়েক দিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সেন্টিমিটার গভীর করে লাঙ্গল বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিতে হবে। এরপর মুগুর দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও ঢেলা মুক্ত করে তৈরি করতে হবে। সব আগাছা ফেলতে হবে। মাটি, বালু, ১০০ গ্রাম চুন ও পচা গোবর-সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেওয়াই ভালো। উর্বরতা কম হলে প্রতি ১০০ গ্রাম টিএসপি সার মেশাতে হবে বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদনের জন্য ইট-সিমেন্ট দিয়ে স্থায়ী বীজতলা তৈরিই শ্রেয়।



চিত্র: আদর্শ বীজতলা প্রস্তুতের কার্যক্রম

বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। বীজতলা সাধারণত ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে তৈরি করতে হবে। জমির অবস্থাভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে বড় জমিকে ভাগ করে এভাবে একাধিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখতে হবে এবং চারপাশে ২৫ সেমি খালি জায়গা রাখতে হবে। খালি জায়গার মাটি ৫ সেমি গভীর করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বীজতলার উপর উঠিয়ে দিতে হবে। ।

২.২.৭ বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ

মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বীজতলাকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ বা শোধন বলে। বীজ বপনের আগে বীজতলার মাটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। এতে অনেক মাটিবাহিত রোগ, পোকামাকড় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়।

নিম্নে বীজতলা শোধন পদ্ধতি গুলোর বিবরণ দেয়া হলো

ক) তাপ প্রয়োগ

চারটি পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগ করে বীজতলার জীবাণুমুক্ত করা যায়।

১। লোহার কড়াই বা ড্রামের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করণঃ বীজতলার উপরের স্তরের ১০-১৫ সেমি গভীর করে মাটি তুলে চুলার উপর লোহার কড়াই বা ড্রামে নিয়ে ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় তাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে ১ ঘন্টা সময় আগুনের তাপে মাটিকে ভেজে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়। ২০২১

২। সরাসরি তাপের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ: বীজতলার উপরে ভাল ভাবে খড় বিছিয়ে দিয়ে তারপর ঐ খড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। ঐ আগুনের তাপে বীজতলার উপরের ৫ সেমি মাটি জীবাণুমুক্ত হবে। এ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করার পর খড় পোড়া ছাই মাটির সাথে এমন ভাবে মেশাতে হবে যেন বীজতলার মাটির ২-৩ সেমি গভীরতার নিচে না যায়। প্রতিবারই বীজ বপনের পূর্বে এভাবে মাটি শোধন করে নিতে হবে। তাপের মাধ্যমে বীজতলা জীবাণুমুক্ত করতে গেলে মাটিতে রক্ষিত নাইট্রোজেন সার বাতাসে উড়ে যায় ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দেয়।

৩। বাষ্পের মাধ্যমে জীবানুমুক্তকরণ: এই পদ্ধতিতে বীজতলার উপরিভাগের ১০ সে.মি. মাটির মিশ্রণের ভিতর গরম পানির ভাপ ৭০ ডিগ্রী সে: গ্রে: তাপমাত্রায় আধাঘন্টা রাখা হলে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু উপকারী জীবাণুর তেমন ক্ষতি হবে না। এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিতে খরচ অনেক বেশী, তাই আমাদের দেশের জন্য তেমন কার্যকর নয়।

৪। সৌর তাপের মাধ্যমে জীবানুকুক্তকরণ: সবচাইতে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি হলো সৌরতাপ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করা। এক্ষেত্রে বীজ বপনের ১২-১৫ দিন পূর্বে বীজতলার মাটি যথাযথভাবে তৈরি করে ভালোভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরে পলিথিন দিয়ে বায়ু নিরোধক করে ঢেকে রাখতে হবে। এতে সারা দিনের সূর্যালোকে পলিথিনের ভেতরে বীজতলার মাটির তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে ও অনেকাংশে মাটিবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করবে। এছাড়াও অনেক ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও আগাছা দমন হয়। এছাড়া তাপবৃদ্ধির ফলে বিষাক্ত এমোনিয়া গ্যাস নির্গত হবে। তাই এ পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করার সাথে সাথে বীজতলায় বীজ বপন করা যাবে না। এই বিষাক্ত গ্যাস কোদাল দিয়ে কোপালে ধীরে ধীরে বের হয়ে যাবে। তারপর বীজ তলায় বীজ বপন করা যাবে।

খ) রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সবজি চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বীজতলায় রাসায়নিক দ্রব্য যেমন ফরমালডিহাইড পানিতে মিশিয়ে (৫০: ১) ব্যবহার করা হয়। বীজতলা জীবানুমুক্ত করার জন্য প্রতি ১ লিটার বাণিজ্যিক ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ লিটার পানি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রন প্রতি ১ বর্গ মিটার বীজতলার জন্য প্রায় ১২ লিটার হারে বীজতলার উপর ছিটাতে হবে। তারপর বীজতলা ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ ২ দিন ত্রিপল বা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে- যাতে ফরমালিনের বাস্প বা গ্যাস সংরক্ষণ করা যায়। এরপর ত্রিপল বা পলিথিন সরিয়ে দিয়ে বীজতলা ১০-১৫ দিন উন্মুক্ত রাখতে হবে। এসময় কোদাল দিয়ে বীজতলা ভালোভাবে কোপায়ে ফরমালিনের গ্যাস বের করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ফরমালিণের গন্ধ থাকবে ততক্ষণ ঐ বীজতলায় বীজ বপন করা ঠিক হবে না। এই পদ্ধতিতে বীজতলার মাটিতে বসবাসরত সব ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু কিছু আগাছা বীজও ধ্বংস হয়ে যাবে।

পোলট্রি রিফিউজ বা লিটার ব্যবহার করেও বীজতলায় মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আংশিকভাবে বীজতলার মাটি শোধনের প্রক্রিয়া বর্তমানে দেশের অনেক সবজি উৎপাদন এলাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৩ বীজতলায় বীজ বপন ও চারা ব্যবস্থাপনা

২.৩.১ বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলার উপরের স্তর ভালভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। এতে মাটির ভিতরে সহজেই বাতাস ও পানি চলাচল করতে পারবে। চারাগুলোর শিকড় সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে খাদ্য ও রস গ্রহণ করতে পারবে। এরপর বীজতলার উপরের স্তর সমান করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের সময় সমস্ত বীজতলা জুড়ে সমানভাবে বীজ ছিটিয়ে বা লাইন করে বীজ বপন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বীজতলার কোথাও যেন বেশী বীজ এবং কোথাও কম বীজ না পড়ে। তবে ছিটিয়ে বীজ বপনের চেয়ে লাইনে বীজ বপন করা উত্তম, কারণ উৎপন্ন চারাগুলো ঠিকমত আলো বাতাস পায়, খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা কম হয়, সুস্থ সবল ও মান সম্পন্ন চারা উৎপন্ন হয়।

সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। শুকনা মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেওয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেওয়া মাটির জো অবস্থা এলে বীজ বপন করতে হয়। কোন কোন সবজির বীজ কিছু সময় ভিজিয়ে রাখার পর বপন করা হয়। যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণত বোনার আগে পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাত ভিজিয়ে বপন করতে হয় (যেমন লাউ, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, করলা, উচ্ছে ও ঝিঙা)। এতে বীজে অংকুরোদগম ভাল হয়। তবে কপি জাতীয় সবজি ও টমেটোর বীজ বপনের পুর্বে ভিজানোর প্রয়োজন পড়ে না।

২.৩.২ বীজতলার পরিচর্যা

বীজতলায় বীজ বপনের ২ দিন পর থেকে বীজ কি পরিমাণ গজালো তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজ গজানো শুরু হলে সাথে সাথে বীজতলা ঢেকে রাখা চাটাই তুলে ফেলতে হবে। গজানো চারা অতিরিক্ত রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী ঝাপ ব্যবহার করতে হবে। চাটাই অথবা ঝাপ বা আচ্ছাদন এমন ভাবে খুটির উপরে দিতে হবে যেন বীজতলা থেকে ১.৫ ফুট বা ৪৫ সে:মি: উপরে থাকে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগের চারা ঢেকে রাখতে হবে এবং সকাল বিকাল চাটাই অথবা ঝাপ সরিয়ে দিয়ে চারাগুলোতে রোদ বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারাগুলো যতই আকারে বাড়বে ততই তাদের রোদের তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন বোধে সকাল বিকাল ঝাঝারি দিয়ে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স ১০/১২ দিন হলে কাঠ অথবা ক্ষুদ্রাকার নিড়ানী বা বাঁশের কাঠি দিয়ে বীজতলার মাটি হালকাভাবে আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে। এই ভাবে প্রতি ২/৩ দিন অন্তর অন্তর মাটি আলগা করতে হবে। কপির বীজ গজানোর ১৪/১৫ দিন পর অথবা চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে অন্য একটি আলাদা বীজতলায় রোপণ করলে শিকড় অধিকতর শক্তিশালী হয় ও উৎপাদন ভালো হয়। চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে, প্রতি লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম ইউরিয়া সার গুলে চারার উপর স্প্রে করলে চারা গুলো আরোও সতেজ হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বেশী ইউরিয়া সার দেয়া ঠিক হবে না।

চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে কুমড়াজাতীয় ফসলে রেড পাম্পকিন বিটল ও বিভিন্ন সবজির ভাইরাসের বাহক পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়। বীজতলার মাটি যদি ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে তবে মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে পড়ে এতে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগের ভিতর গোড়া পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এই রোগের কারণে অনেক সময় চারা উৎপাদন কষ্টকর হয়। এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বীজতলা শুকনা রাখা, কুপ্রাভিট অথবা ডাইথেন এম-৪৫ ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সেচের পানির সাথে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২.৩.৩ চারার কষ্টসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

বীজতলায় চারা বৃদ্ধিকালীন সময়ে এদের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে চারার কষ্টসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা যায়। বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমান কমিয়ে বা দুই সেচের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা হয়। সাধারণত ৭-১০ দিন এ প্রক্রিয়া চালানো হয়। বেশি দেরি হলে ফলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ প্রক্রিয়ায় চারায় অধিক শর্করা জমা হয় যা চারাকে বিভিন্ন ধকল থেকে বাঁচায়।

২.৪ চারা উত্তোলন ও স্থানান্তর

২.৪.১ চারা উত্তোলন

চারা তোলার সময়

চারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বীজতলায় রাখা যাবে না। বীজ বপনের ২৫-৪৫ দিনের মধ্যে অধিকাংশ চারা রোপণের উপযোগী হয়। বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক হলে বীজ বপনের কতদিন পরে বিভিন্ন প্রকার সবজির চারা রোপনের উপযোগী হয় তা নিচের তালিকা এ দেখানো হলো। তবে চারা তোলার ৫-৭ দিন আগে থেকে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এতে গাছে শর্করার পরিমাণ বেশী হবে ও চারা তোলাজনিত আঘাত সহ্য করতে পারবে।

বিভিন্ন চারার উত্তোলনকালীন উপযুক্ত বয়স নিচের তালিকায় দেখানো হলোঃ

চারার নাম	রোপণের সময়কাল	চারার নাম	রোপণের সময়কাল
ফুলকপি	২৫-৩০ দিন	টমেটো	৩০-৩৫ দিন
বাধাকপি	২৫-৩০ দিন	বেগুন	৪০-৫০ দিন
ওলকপি	২৫-৩০ দিন	মরিচ	৪০-৫০ দিন
শালগম	২৫-৩০ দিন	পেঁয়াজ	৪৫-৫০ দিন
লেটুস	২৫-৩০ দিন	পুঁইশাক	২৫-৩০ দিন
বিট	২৫-৩০ দিন	লাউ	১৫-১৬ দিন
চায়নাকপি	২৫-৩০ দিন	মিষ্টিকুমড়া	১৫-১৬ দিন

চারা উত্তোলন পদ্ধতি

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর সময় একবার হালকা সেচ দিয়ে চারা উঠানো উচিত, এতে চারার শিকড় কম

২০২৫

ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে। চারার গোড়ায় মাটি থাকলে শিকড় কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটি চোখা বাঁশের কঞ্চি বা সরু কাঠির লাঠি বা প্লাস্টিকের চামচ চারার পাশ দিয়ে মাটিতে ঢুকিয়ে আড়াআড়িভাবে চাপ দিলে চারা সহজেই মাটিসহ উঠে আসবে।



চিত্র: টমেটোর চারা উত্তোলন

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মূল জমিতে লাগানো উচিত।

২.৪.২ চারা স্থানান্তর

চারা সংরক্ষণ ও পরিবহণ

চারা উঠানোর পর পরই রোপন করা উচিত, এতে করে চারার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তবে অনেক সময় চারা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। তখন ঠান্ডা অন্ধকারযুক্ত স্থানে চারা ২৪ ঘন্টা থেকে ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সেক্ষেত্রে চারার পাতায় প্রয়োজনমত পানি ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। উৎপাদিত চারা দূর দুরান্তে নেওয়ার পূর্বে ও চারা তোলার পূর্বে ভালো ভাবে সেচ দিতে হবে যাতে পরিবহনের সময় চারার শরীরে পানির অভাব দেখা না দেয়।

চারা বিক্রয়

চারা রোপনের উপযুক্ত হলে বিক্রয় করতে হবে। চারা বিক্রির জন্য তোলার সময় চারা তোলার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিক্রিত চারা কলাপাতা, কচুপাতা অথবা পলিথিন কাগজ দিয়ে গোড়া বেঁধে পাতার উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিয়ে ক্রেতার হাতে দিতে হবে। উৎকৃষ্ট চারাতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে-

ক) চারা স্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ আকারে অত্যাধিক বড়ও নয়, ছোটও নয়

খ) অনধিক ৬টি পাতাযুক্ত

গ) রোগের সব লক্ষণ থেকে মুক্ত

ঘ) শিকড় অক্ষত এবং মাটির দলায় জড়ানো

ঙ) পুরু কান্ড ও সতেজ চেহারা এবং

চ) স্বাভাবিক সবুজ পাতা। অত্যাধিক গাঢ় সবুজ বর্ণের চারায় নাইট্রোজেনের অধিক্যই নির্দেশিত হয়, তাই এসব চারা দুর্বল।

২.৫ সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তার

কিছু সবজির বংশবিস্তারে অযৌন প্রক্রিয়াই মুখ্য। এর কারণ এসব সবজির বীজ উৎপাদন কষ্টকর। অধিকাংশ সময় এসব অঙ্গজ অঙ্গ সংগ্রহ করা যায় সহজেই এবং অল্প পরিশ্রমে।

২.৫.১ অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা

সবজিতে অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। অল্প খরচে, অধিক ফসলের জন্য অঙ্গজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতে পারে। অনেক সময় বীজ দিয়ে অধিক ফলন আশা করা যায় না। আবার বীজের অধিক ব্যবহার এড়িয়ে খরচ কমানো সম্ভব। যেমন- কলমিশাক প্রথমবার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে। পরবর্তীতে শাখাকলমের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা হয়।

অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণ সংগ্রহ করতে উন্নত কৌশল, প্রযুক্তি ও যন্ত্র প্রয়োজন-যা সব সময় ব্যবস্থাপনা করা যায় না। যেমন- আলু সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সাইজের আলু গ্রেডিং করে তা হিমাগারজাত করে রাখতে হবে। তা না হলে ভালো টিউবারের অভাবে ফলন বাধাগ্রস্থ হতে পারে। আবার টিউবারের কর্তিত অংশ জীবাণুমুক্ত করে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়।

২.৫.২ সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারে ব্যবহৃত বিভিন্ন অঙ্গ বা উপকরণ

সবজির অযৌন বা অঙ্গজ বংশবিস্তারে নিম্নলিখিত অঙ্গ বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১। শাখাকলম (Stem cutting)

২। শল্ককন্দ (Bulb)

৩। গুঁড়িকন্দ (Corm)

৪। রাইজোম (Rhizomes)

৫। কন্দ (Tuber)

৬। টিউবারকল বা বুলবিল (Tubercle)

৭। গুঁড়িচারা (Sucker)

৮। কন্দমূল (Tuberous root)

১। শাখাকলম (Stem cutting)

কান্ডের টুকরা অংশ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপাদন করাকে শাখাকলম বলে। উদাহরণস্বরূপ মিষ্টি আলু, পুঁইশাক, কলমিশাক, পটল ইত্যাদি বংশবিস্তারে ব্যবহৃত কান্ডের টুকরা অংশ কমপক্ষে ২-৩ টি গিট বা আইকসহ সে.মি. লম্বা হতে হবে। কান্ডটির দুই-তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে বাকি অংশ মাটির উপরে রেখে উত্তর -পূর্ব দিকে মুখ করে ৪৫° কোণে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

২। শল্ককন্দ (Bulb) এটি একটি বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত কান্ড যা খাটো প্রকৃতির এবং গোলাকার চাকতির মত। এটি ভূনিম্নস্থ যা রসালো শল্কপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। শল্কপত্র হল পাতার রূপান্তরিত নিম্নাংশ। শল্ককন্দে একটি শীর্ষমুকুল থাকে, যা থেকে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। শল্ককন্দ ও কোয়া ব্যবহার করে পেঁয়াজ ও রসুনের বংশবিস্তার করা হয়।



চিত্র: রসুন ও পেঁয়াজের শল্ককন্দ

৩। গুঁড়িকন্দ (Corm) এটি একটি ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড। কাণ্ডের অক্ষের নিম্নাংশ নিরেট ও মাংসল অঙ্গে পরিণত হলে তাকে বলা হয় গুঁড়িকন্দ। এর গায়ে সমান্তরাল রেখার আকারে পত্রদাগ (Leaf scar) থাকে। গুঁড়িকন্দের আইক থেকে যেসব ক্ষুদ্রাকার শাখা বের হয় সেগুলো মুখী বা গুঁড়িকন্দ (Cormel) নামে পরিচিত। কচু জাতীয় সবজিগুলোতে বংশবিস্তার করতে গুঁড়িকন্দ ও মুখী ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



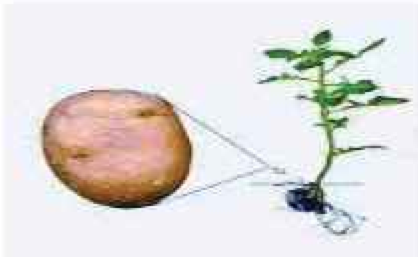
চিত্র: কচুর গুঁড়িকন্দ

৪। রাইজোম (Rhizomes) রাইজোম এক ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড, যা মাটিসংলগ্ন বা মাটির ভেতরে পাশের দিকে বিস্তার লাভ করে। আদা, হলুদ ইত্যাদি বংশবিস্তার রাইজোমের মাধ্যমে করে থাকে।



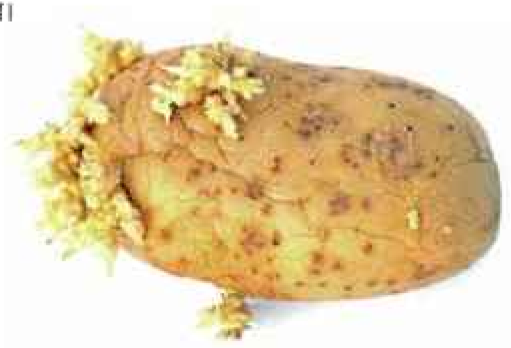
চিত্র: আদার রাইজোম

৫। কন্দ (Tuber) কন্দ একটি ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড। কান্ডের ভূ-নিম্নস্থ শাখার নিম্নভাগ থেকে সূত্রবৎ অকারের অঙ্গ সৃষ্টি হয় যাকে স্টোলন বলে।এই স্টোলনের অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার দরুন স্ফীত হয়ে টিউবার উৎপাদন করে। এর গায়ে অবস্থিত চোখসমূহ কান্ডের কাক্ষিক কুঁড়ির অবস্থান নির্দেশ করে। সাধারণত চোখের নিচে শল্কপত্র থাকে। টিউবার দিয়ে আলুর বংশবিস্তার করা যায়।



চিত্র: আলুর কন্দ

৬। টিউবারকল বা বুলবিল (Tubercle) কান্ডের ভূ-উপরস্থ কক্ষের কুঁড়ি অনেক সময় স্বাভাবিক শাখায় পরিণত না হয়ে রূপান্তরিত হয়ে স্ফীত, গোলাকার, মাংসল অঙ্গ সৃষ্টি করে। এদেরকে টিউবারকল বা বুলবিল বলা হয়। মোটে আলু এর সাহায্যে বংশবিস্তার করে। উপযুক্ত পরিবেশে রসুনেরও এ ধরনের বুলবিল উৎপন্ন হয়।



চিত্র: আলুর টিউবারকল



চিত্র: মেটে আলুর টিউবারকল

৭। গুঁড়িচারা (Sucker) উদ্ভিদের কান্ডের ভূসংলগ্ন অংশ বা মূল থেকে পার্শ্বমুকুল বের হয়। প্রথমাবস্থায় এগুলো মাতৃ উদ্ভিদ থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। পরে নিজস্ব শিকড় ও পত্র পল্লব উৎপাদন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো সাকার, রেটুন ইত্যাদি বলা হয়। গুঁড়িচারা কান্ডজ বা মূলজ হতে পারে। মানকচু গুঁড়িচারা উৎপাদন করে। বাঁধাকপি, ফুলকপির ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যক্ত অংশ থেকে গুঁড়িচারা বের হয়, যা প্রজননে কাজে লাগে।

৮। কন্দমূল (Tuberous root) এটি একটি ভূ-নিম্নস্থ মূল। খাদ্য জমা হয়ে স্ফীত হয়ে উঠে। এদের গায়ে অস্থানিক মূল থাকে যা থেকে চারা বের হয়। মিষ্টি আলু, চারকোণী শিম, কাকরোল ইত্যাদির বংশবিস্তার কন্দমূল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



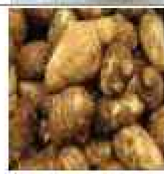
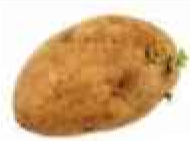
চিত্র: মিষ্টি আলুর কন্দমূল

পাঠ সংক্ষেপ

- দ্বিবর্ষজীবী সবজি হলো বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি, শালগম, পেঁয়াজ, গাজর ইত্যাদি
- বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির অ্যানথ্রাকনোজ, পাতায় দাগ, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়
- চারা তৈরির জন্য বীজ বোনা হয় যে জমিতে তাকে বীজতলা বলে
- উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটি বীজতলার জন্য উপযোগী
- মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণ থেকে বাঁচতে বীজতলাকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ বলে
- কপি জাতীয় সবজি ও টমেটোর বীজ বপনের পূর্বে ভিজানোর প্রয়োজন পড়ে না
- চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে কুমড়াজাতীয় ফসলে রেড পাম্পকিন বিটল ও বিভিন্ন সবজির ভাইরাসের বাহক পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়
- চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে, প্রতি লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম ইউরিয়া সার গুলে চারার উপর সেপ্র করলে চারা গুলো আরোও সতেজ হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বেশী ইউরিয়া সার দেয়া ঠিক হবে না
- বীজতলা থেকে চারা উঠানোর সময় একবার হালকা সেচ দিয়ে চারা উঠানো উচিত, এতে চারার শিকড় কম ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে
- শল্কপত্র হলো পাতার রুপান্তরিত নিম্নাংশ
- কন্দ একটি ভূ-নিম্নস্থ রুপান্তরিত কান্ড

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারের বিভিন্ন অঙ্গ বা উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছ। তুমি ছবি দেখে সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের নাম এবং উদাহরণ উল্লেখ কর।

ক্র/নং	অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের নাম	অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের ছবি	উদাহরণ
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতোমধ্যে তুমি সবজির চারা কিভাবে উৎপাদন করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা কি ভাবে বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি বীজ সংগ্রহ কোথা থেকে করেছেন এবং বীজের মান বা বৈশিষ্ট্য, বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও পরিচর্যা সম্পর্কে তোমার সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে কি বলে?
২। বীজতলার জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী?
৩। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন?
৪। টমেটো, বেগুন কত ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে?
৫। বীজ শোধনে ব্যবহৃত দুইটি রাসায়নিক ঔষধের নাম লিখ।
৬। বীজতলার উর্বরতা কম হলে কি সার কি পরিমানে ব্যবহার করতে হবে?
৭। বীজতলার চারার বৃদ্ধি কম হলে কি করতে হবে?
৮। সবজির চারা উৎপাদনের জন্য একটি আদর্শ বীজতলার চিত্র অংকন করে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
৯। বীজতলার চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় কেন পানি দিতে হবে?
১০। সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারে কয় ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়?
১১। আলু, মেটে আলু কোন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করতে পারে?
১২। আদা ও হলুদের বংশবিস্তার কোন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞান কাকে বলে?
২। ভক্ষণীয় অংশভিত্তিক সবজির প্রকারভেদ লিখ।
৩। সবজি বীজের প্রকারভেদ বর্ণনা করো।
৪। ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
৫। ভালো বীজ সংগ্রহের উৎসগুলো লিখ।
৬। বীজতলা নির্বাচনে কি কি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে?
৭। স্থানান্তর ও অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা কাকে বলে?
৮। বংশবিস্তারকারী অঙ্গজ উপকরণগুলোর নাম লিখ।
৯। অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা লিখ।
১০। চারার কষ্টসহিষ্ণুতা পদ্ধতি বর্ণনা করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাকসবজির গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। শাকসবজি চাষের সমস্যা বর্ণনা করো।

৩। বীজতলা কাকে বলে? বীজতলার স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৪। বীজতলা প্রস্তুতকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি আলোচনা করো।

৫। বীজতলায় বীজ বপন, চারার পরিচর্যা ও চারা উত্তোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৫। সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারকারী উপকরণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করো।

জব ২.১: সবজির বীজহার নির্ণয়ের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- সবজির বীজ হারের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- বীজ হার সম্পর্কিত সূত্রটি লিখতে পারবে।
- বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন সবজির বীজ হার নির্ণয় করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;

৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

কোন নির্দিষ্ট একক পরিমান জমিতে সার্থকভাবে ফসল জন্মানোর জন্য যে পরিমান বীজ বপন করতে হয় তাকে বীজ হার বলে।

বীজ হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

$$\text{হে: প্রতি বীজ হার (Seed rate)} = \frac{\text{হেক্টর প্রতি কাংখিত গাছের সংখ্যা} \times \text{প্রতি বীজের গড় ওজন (গ্রাম)}}{\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার} \times \text{অংকুরোদম হার} \times \text{জমিতে বপনের পর বীজের সম্ভাব্য অংকুরোদগমের হার}}$$

উপরোক্ত পদ্ধতিটি রোপণ পদ্ধতির বেলায় প্রযোজ্য। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে রোপণের বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে সবজির বীজ হার পাওয়া যাবে। আবার সারির বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে ছিটিয়ে বপনের বীজ হার পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বিভিন্ন সবজি বীজ, ২। পেট্রিডিস, ৩। চোষ কাগজ বা ব্লটিং পেপার, ৪।অপসেট কাগজ, ৫। কলম, ৬। ক্যালকুলেটর।

কাজের ধারা

১) প্রতিটি সবজির ক্ষেত্রে সারি হতে সারি এবং গাছ থেকে গাছের সুপারিশকৃত চাষাবাদ দূরত্ব জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বারি কৃষি প্রযুক্তি হাত বই অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এ সংক্রান্ত ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

২। সারি ও গাছের দূরত্ব গুণ করে মিটারে বের করতে হবে।

৩। ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গমিটারকে সারি ও গাছের দুরত্বে গুণফল দিয়ে ভাগ করে হেক্টরপ্রতি সম্ভাব্য গাছের সংখ্যা বের করে নিতে হবে।

৪। সবজির অনেকগুলো বীজের ওজন মেপে নিয়ে তাকে বীজের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে বীজের গড় ওজন বের করে নিতে হবে।

৫। ১০০ গ্রাম বীজে পুষ্ট ও বিশুদ্ধ বীজের পরিমান মেপে নিতে হবে।

৬। ১০০টি বীজ পেট্রিডিসে ভিজা চোষ কাগজে রাখতে হবে এবং কতটি বীজ অংকুরিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৭। অংকুরিত বীজের সংখ্যাটিকে উক্ত বীজের অংকুরোদগমের শতকরা হার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৮। মাঠ পর্যায়ে আদর্শ হিসেবে বীজ অংকুরোদগমের হার ৮০% বলে গণ্য করতে হবে।

৯। প্রতিটি শতকরা হারকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে।

১০। এবার একটি অপসেট কাগজ নিয়ে তাতে বীজহারের সূত্রটি লিখে তাতে উপরোক্ত মানগুলো বসাতে হবে।

১১। ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সূত্রের তথ্যগুলো সরলীকরণ করতে হবে।

১২। এভাবে হেক্টরপ্রতি নির্ণীত বীজহার কেজিতে রূপান্তর করার জন্য একে ১০০০ দ্বারা ভাগ করতে হবে।
১৩। এবার ধারবাহিকভাবে কাজটি নিরীক্ষণ করে নিতে হবে এবং নির্ভুলভাবে খাতায় লিখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সূত্রের মান বসানোর সময় নির্ভুলভাবে বসাতে হবে।
২। ক্যালকুলেটর বা গণনা যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে তথ্য দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সবজির বীজের হার নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.২: সবজির আধুনিক বীজতলা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- জমি নির্বাচন, বীজতলার মাটি প্রস্তুতকরণ ও জীবাণুমুক্ত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, জৈব ও অজৈব সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা ;
৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা ;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা ;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা ;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

সুস্থ, সবল ও নিরোগ চারা উৎপাদনের জন্য যে স্থান বা পাত্র ব্যবহার করা হয় ঐ স্থান বা পাত্রকে বীজতলা বলা হয়। বীজতলায় বীজ বপনের পর চারাকে সুনির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত রেখে যত্ন করতে হয়। তৈরির ধরন অনুযায়ী বীজতলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা ও ২। অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা।

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: প্লাস্টিকের পাত্র, বড় ট্রে, বাঁশের বড় বেড়া, ভাসমান বীজতলা ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি ও সার মিশিয়ে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা তৈরি করা যায়।সাধারণত বন্যা বা অতি বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য এ ব্যবস্থ অনুরণ করা হয়।

২। অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: সরাসরি ভূপৃষ্ঠের উপর যে বীজতলা তৈরি করা হয় তাকে স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা বলা হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বীজতলা বেশি ব্যবহার হয়।

সুনিষ্কাশিত, উঁচু, বন্যামুক্ত, আলো-বাতাসযুক্ত, নিরাপদ ও উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটির জমি বেছে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বীজতলা তৈরির উপযোগী জমি, ২। কোদাল বা লাঙ্গল, ৩। মই, ৪। নিড়ানী, ৫। আঁচড়া, ৬। খুটি, ৭। রশি, ৮। মেজারিং টেপ, ৯। জৈব ও রাসায়নিক সার, ১০। ওজন মাপার যন্ত্র, ১১। ঝুড়ি বা প্লস্টিকের বাটি, ১২। ঝাঁঝরি, ১৩। পলিথিন, ১৪। টুকরি, ১৫। খড়কুটা ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ুচলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উঁচু উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরির জন্য জমিকে গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, আগাছামুক্ত ও সমতল করতে হবে। বীজতলা সাধারণত ১০-১৫ সেমি উঁচু করে তৈরি করতে হবে।

৩। ভালভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারদিকে ২৫ সেমি চওড়া এবং ১৫ সেমি গভীর নালা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় দাঁড়ানো পানি থাকলে চারা দুর্বল ও রোগাক্রান্ত (গোঁড়া পচা রোগ) হয়ে পড়ে।

৪। বীজতলার আশেপাশে ঝোপ-জংগল থাকলে পোকা ও রোগের আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য ঝোপ-জংগল, শিকড়-বাকড় পরিষ্কার করতে হবে।

৫। বীজতলা সাধারণত ৩ ফুট বা ১ মিটারের বেশি চওড়া না হওয়া সুবিধাজনক। চারা তৈরি করার জন্য সাধারণত ৩ X ১ মিটার আকারের কয়েকটি বীজতলা তৈরি করে নিতে হবে।

৬। দুটি বীজতলার বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি চওড়া এবং ১০ সেমি গভীর নালা করতে হবে।

৭। নালার মাটি কোদাল দিয়ে বেডের উপর তুলে দিতে হবে।

৮। প্রতিটি বীজতলার মাটিতে ১০-১৫ কেজি পাতা পঁচা সার বা গোবর সার ও ১০০ গ্রাম চুন দিতে হবে। ১৫০ গ্রাম টিএসপি ১০০ গ্রাম এমওপি বীজতলার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৯। বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ: বীজতলা জীবাণুমুক্ত না করলে চারার শিকড়ে গোড়া পঁচা ও বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় রোগ হয়। আবার অনেক সময় নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণে শিকড়ে গিট হয়।

দুই পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করা যায়, যেমন- ১। তাপ প্রয়োগ এবং ২। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে।

তাপ প্রয়োগের সময় সাধারণত খড়কুটা বীজতলার উপরিভাগে রেখে জ্বেলে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। আর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ পদ্ধতির বেলায় ১ ভাগ কমার্শিয়াল ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ গুণ পানি মিশিয়ে তা বীজতলার মাটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে।

আবার অনেক সময় স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিলে সূর্যতাপে বীজতলার মাটি সারাদিনের সূর্যালোকে শোধিত হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে কৃষকরা জমি তৈরির সময় সানফুরান বা কার্বোফুরান জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করে থাকে।

১০। জীবাণুমুক্তকরণের পর মাটি কোদাল দিয়ে গভীরভাবে কুপিয়ে উপরের মাটি সমতল করে দিতে হবে।

১১। এভাবে বীজতলা বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

১২। বীজতলাকে অতিবৃষ্টি, প্রখরতাপ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপল বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে বীজতলায় সমানভাবে পড়ে।

২। সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩। ফরমালডিহাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি আধুনিক বীজতলা তৈরি ও জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
শাকসবজি চাষ
(Cultivation of Vegetables)



আমাদের দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ৬টি খাদ্যোপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবন অন্যতম। শাকসবজি ভিটামিন- ও খনিজ লবন এর অন্যতম উৎস। পুষ্টিমানের দিক থেকে সবজি ফসল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য সবজি চাষের আধুনিক কলাকৌশল বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ কৌশল জানা জরুরী। সবজি চাষাবাদ একটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সবজি ফসল উৎপাদন অন্যান্য ফসলের মতো নয়। সবজি ফসল উৎপাদনের জন্য নিবিড় বা বিশেষ ধরনের যত্নের প্রয়োজন হয়। এর জন্য কিছু মৌলিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

এই অধ্যায় শেষে-

- সবজির বীজ শোধন, বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন করতে পারবে
- সবজি চাষের উপযোগী জমি ও মাটি নির্বাচন এবং জমি প্রস্তুত করতে পারবে
- সবজি চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের নাম, গুণাগুণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সবজি ফসলে পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও ফসল পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- সঠিক উপায়ে সবজি সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা করতে পারবে

৩.১ জমি ও মাটি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

৩.১.১ জমি ও মাটি নির্বাচন

ফল জাতীয় সবজি (বেগুন, ঢেঁড়শ, মরিচ, বরবটি, শিম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, কাঁকরোল, পেঁপে ইত্যাদি) চাষের জন্য বেশি আলোর দরকার হয়। শাক ও মূলজাতীয় সবজি (ডাঁটা, পুঁইশাক, কলমিশাক, লেটুস, বিট, মূলা, শালগম) কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি

ছায়াতেও ভালোভাবে জন্মাতে পারে। সবজি চাষের জমি পানি সেচ ও নিকাশের সুবিধাযুক্ত, রৌদ্রময়, উঁচু ও বসতবাড়ির কাছে হলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে জমির মাটি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু থাকা ভাল। সবজির বাজারজাতকরণে কোন সমস্যা হবে না এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

দো-আঁশ মাটি সবজির জন্য অতি উত্তম। এটেল দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভাল হয়। তবে মাটি যেন জৈব সার সমৃদ্ধ হয়। মূল বা কন্দজাতীয় সবজির জন্য বেলে দো-আঁশ মাটি খুব ভাল। অধিকাংশ সবজির জন্য পিএইচ (pH) এর মান ৬-৭ ভালো। মাটি বেশি অম্লীয় (৭ এর নিচে) বা ক্ষারীয় (৭ এর উপরে) হলে উদ্ভিদের কয়েকটি খাদ্যোপাদান শোষণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। অম্লত্ব কমাবার জন্য মাটিতে চুন এবং বৃদ্ধির জন্য সালফার প্রয়োগ করতে হবে।

৩.১.২ জমি প্রস্তুতকরণ

লাভজনকভাবে সবজি উৎপাদন করতে হলে ভালভাবে জমি প্রস্তুত করতে হয়।

এ ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যথা-

১। প্রাথমিকভাবে জমি তৈরিকরণ: সাধারণত মাটিতে 'জো' (মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা) আসার সাথে সাথে পাওয়ার টিলার বা লাঙ্গলের সাহায্যে ১৫-২০ সে.মি. গভীর চাষ করে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও ঢেলামুক্ত করতে হবে। মাটি এমনভাবে চাষ করতে হবে যেন খুব বেশি গভীর মাটি উপরে উঠে না আসে। জমি ভিজা থাকাকালীন চাষ দেয়া উচিত নয়। এঁটেল মাটি ভেজা অবস্থায় চাষ করলে এর ঢেলা ভাঙ্গা কঠিন হয়ে পড়ে। দো-আঁশ মাটি কিছু ভেজা অবস্থায় চাষ করা গেলেও মাটি শুকানোর পূর্বে মই দেয়া উচিত নয়। জমি তৈরিকরণের সময় অর্থাৎ শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার (Basal) জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হয়।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ: বেশির ভাগ ফসল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য সেচ দিতে হবে এবং পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক) কেয়ারী নালা (২০ সে.মি.) পদ্ধতি: জমি চাষ করার পর রোপণ দূরত্বের সাথে সংগতি রেখে ১৫-২০ সে.মি. চওড়া অগভীর নালা কেটে একে সরু লম্বা ফালিতে বিভক্ত করে কেয়ারী বা বেড তৈরি করতে হবে। নালার মাটি দিয়ে দু'পাশের কেয়ারীগুলোকে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করা হয়। নালাগুলো পানি সেচ, নিষ্কাশন বা ফসলের পরিচর্যামূলক কাজের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- টমেটো, বেগুন, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

খ) কেলি নালা (২০ সে.মি.) পদ্ধতি: সারির মাটি না খুড়ে অর্থাৎ নালা না করে সারির দাগ বরাবর বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে বপন করার পর দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গা হতে মাটি টেনে উঁচু করে বীজ ঢেকে নালা তৈরি করা হয়। যথা- আলু, লেটুস, মটরশুঁটি, ঢেঁড়স ইত্যাদি।



চিত্র: কেলি নালা পদ্ধতিতে আলু চাষা

গ) গর্ত বা মাদা পদ্ধতি: শিম ও কুমড়া পরিবারের সবজির শিকড় এবং কান্ডের শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বেশি ছড়ায়। তাই সেগুলো আবাদের জন্য জমিতে যথেষ্ট ফাঁক ফাঁক করে গর্ত বা মাদা তৈরি করে বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়। মাদা তৈরির জন্য সাধারণত ৫০-৬০ সে.মি. ব্যাস ও ৪০-৫০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুড়তে হয় এবং এর মাটির সাথে বীজ বপন বা চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে মৌল সারের অর্ধেক পরিমাণ মাটিতে মিশিয়ে গর্ত বা মাদা ভর্তি করতে হয়।

ঘ) জুলি পদ্ধতি: বীজ বপনের জন্য জমি ও কেয়ারীর উপর অগভীর খাদ বা নালা কাটা হয় তাকে জুলি পদ্ধতি বলে। কোদাল, পুরাতন লাঙ্গল বা অণ্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে জুলি কাটা হয়। যেমন- গিমাকলমি, আদা ইত্যাদি।

সার: মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য জমিতে যে দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে সার বলে। সার মূলত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা- জৈব সার এবং অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার: গোবর, গোচেনা, কম্পোস্ট, হাঁস-মুরগী বিষ্ঠা, খৈল, সবুজ সার, কচুরিপানা ইত্যাদি মিলিয়েই জৈব সার। জৈব সার হচ্ছে মাটির প্রাণ। জৈব সার গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈব সার ব্যবহারে মাটির গুণাগুণ উন্নত হয়। গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে গাছকে সবসময় খাদ্য ও পুষ্টি উপাদান যুগিয়ে থাকে। গাছের অনুখাদ্য উপাদানের উৎস হিসেবে জৈব সারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জৈব সার গ্রীষ্মকালে মাটির রসধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং তাপমাত্রা কমায়। আবার শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখে। কীটনাশকের বিষাক্ততা কমাতে ভাল ভূমিকা পালন করে।

রাসায়নিক সার: খনিজ পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কারখানায় তৈরি সারকে রাসায়নিক সার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। রাসায়নিক সারে এক বা একাধিক খাদ্যোপাদান থাকে। খাদ্যের অভাব হলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তাড়াতাড়ি গাছ খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে। মাটিতে রাসায়নিক সারের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান রাসায়নিক সারগুলো হল ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত কয়েকটি সার ও এতে অবস্থিত রাসায়নিক উপাদানের হার নিচে তুলে ধরা হলো:

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N) (%)	ফসফরাস (P) (%)	পটাশিয়াম (K) (%)	সালফার (S) (%)	দস্তা (Zn) (%)	বোরন (B) (%)
ইউরিয়া	৪৬					
টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট)		২০				
ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট)	১৮	২০				
এমপি (মিউরেট অব পটাশ)			৫০			
জিপসাম				১৮		
জিংক সালফেট (হেপ্টা-হাইড্রেট)				১৮	৩৬	
জিংক সালফেট (মনো-হাইড্রেট)				১১	২৩	
বোরিক এসিড						১৭

জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব

১। জৈব সার মাটির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এতে ফসলের খরা-সহনশীলতা বেড়ে যায় এবং সেচের পানি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

২। গাছের অনুখাদ্য উপাদানের উৎস হিসেবে জৈব সারের ভূমিকা আছে।

৩। জৈব সার গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪। গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখে।

৫। জমিতে কীটনাশক ঔষধ ও রাসায়নিক সারের আধিক্যজনিত কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি হলে জৈবসার ঐ বিষাক্ততা কমাতে সাহায্য করে।

জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের গুরুত্ব

রাসায়নিক সারে এক বা একাধিক খাদ্যোপাদান বেশি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় মাটিতে প্রয়োগের সাথে সাথে এদের খাদ্যোপাদান উদ্ভিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। মাটিতে রাসায়নিক সারের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

সারের চাহিদা নির্ধারণ

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে কোন সবজিতে কিরূপ খাদ্যোপাদান আছে তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশের কৃষি ভিয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। উপজেলা কৃষি অফিসসমূহেও এ ধরনের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন সবজির বিভিন্ন সারের প্রতি আকর্ষণ থাকে। এগুলো হচ্ছে -

১। নাইট্রোজেন পছন্দ করে পাতা জাতীয় সবজি।

২। ফুল ও ফল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও ফসফরাস পছন্দ করে।

৩। কান্ডজাতীয় সবজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে।

৪। লিগুমিনাস জাতীয় সবজি অর্থাৎ শিম পরিবারের সবজি ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে।

৫। মূল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও পটাশ পছন্দ করে।

এসব সবজির সারের প্রতি তাদের আকর্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হয়। সবজি চাষের মেয়াদ বিবেচনায় নিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে সবসময় সামান্য অম্লত্ব হলে ভাল হয়। অম্লত্ব কমাবার জন্য চুন এবং অম্লত্ব বাড়াবার জন্য সালফারসমৃদ্ধ সার দিতে হয়। জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলেও জৈব সার রাখতে হয় বেশি। কারণ জৈব সার গাছকে প্রচুর খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটির স্বাস্থ্য দেখে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগ কার্যক্রম সাধারণত দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে মৌল প্রয়োগ এবং অন্যটি উপরিপ্রয়োগ।

১। মৌল প্রয়োগ: যে সব সার ধীরে ধীরে দ্রবণীয় বা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় এবং সহজে বিনষ্ট হয় না সেগুলো মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। জমি তৈরির সময় মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন জৈব সার, চুন, টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম ইত্যাদি পুরোপুরি মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। আবার মিউরেট অব পটাশ (এমওপি), জিংক সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি মাটির ও ফসলের প্রকারভেদে ২৫-৫০ ভাগ মৌল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

মৌল সার ছিটিয়ে ও স্থানীয় প্রয়োগ এই দুই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়-

ছিটিয়ে প্রয়োগ: এ ক্ষেত্রে জমি চাষের পর সমস্ত জমিতে সার ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ, কম শ্রম ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময়ও কম লাগে।

স্থানীয় প্রয়োগ: অনুর্বর জমিতে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী এবং কম সার ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বীজের কাছাকাছি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশে ও গভীরতায় যথাক্রমে ৮ সে.মি. দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আর গাছের বেলায় শেকড়ের বিস্তৃতি লক্ষ্য করে সার প্রয়োগ করা উচিত। মৌল সার অর্ধেক ছিটিয়ে এবং বাকী অর্ধেক সারি বা শেকড়ের কাছে প্রয়োগ করা উত্তম। নিচে এ ধরনের সার প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো

ক) চারার গর্তে প্রয়োগ: সবজির চারা রোপণের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মৌল সারের অর্ধেক মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকোলী, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি।

২০২৫

খ) মাদায় প্রয়োগ: ফলজাতীয় সবজির বীজ বা চারা জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে মাদা তৈরি করে বপন/রোপণের পূর্বে মাদায় মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। যথা- কুমড়াজাতীয় লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

গ) লাঙ্গল স্তরে প্রয়োগ: জমি তৈরি শেষে লাঙ্গলের সাহায্যে অগভীর নালা তৈরি করে তাতে মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। পরে মই দিয়ে জমি সমান করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। বীজ বা চারার শেকড় বাড়ার পর প্রয়োগকৃত সার শেকড়ের সাহায্যে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ: এ পদ্ধতিতে বীজ ও সার একত্রে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রথায় বীজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একত্রে বীজ ও সার ড্রিল বা বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ না করাই উত্তম।

২। উপরি প্রয়োগ: জমিতে সবজি বীজ বপন বা চারা রোপণ করার পর সার প্রয়োগকে উপরিপ্রয়োগ বলে। সাধারণত ইউরয়া, এমওপি, জিংক সালফেট, ছাই, তরল গোবর সার ইত্যাদি সার জমিতে উপরিপ্রয়োগ করা হয়। সার উপরিপ্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ: ছিটিয়ে বোনা সবজির জন্য নাইট্রোজেন ও পটাশজাতীয় সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা বেশ সহজ। যেমন- মূলা, ডাটা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি।

খ) পার্শ্বপ্রয়োগ: সারি পদ্ধতিতে চাষ করা সবজির পাশে লাইন টেনে তাতে সার প্রয়োগ করা হয়। যথা- ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, গোলআলু, টমেটো, শসা, মুখীকচু ইত্যাদি।

গ) চারা/গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ: মাদায় লাগানো গাছের চারপাশে শিকড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে রিং করে নালা কাটা হয়। এ ক্ষেত্রে নালায় সার প্রয়োগ করে মাটি ঢেকে দেওয়া হয়। যথা- লাউ, শিম, কুমড়াজাতীয় সবজি, শসা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

৩। দ্রবণ আকারে পাতায় প্রয়োগ: বিশেষ ক্ষেত্রে, সার পানির সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে সারের দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে বা সিঞ্চনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। দ্রবণকৃত সার সব সময় পাতার কোষের রসের ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া দরকার। অন্যথায় পাতা পুড়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে যে কোন মুখ্য উপাদানের অর্ধেক ও গৌণ উপাদানের প্রায় সবটুকু সার পাতায় প্রয়োগ করা চলে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ জাতীয় সার অধিক পরিমাণে লাগে বিধায় শুধু পাতায় প্রয়োগ করে সবজি ফসলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তবে গৌণ উপাদান প্রকৃত অনুপাতে দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে করে সবজি ফসলের চাহিদা পূরণ করা যায়।

এছাড়া, ১.০ – ১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকেলে প্রয়োগ করা যায়। এতে পাতাজাতীয় সবজি তাড়াতাড়ি সবুজ ও সতেজ হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলেই প্রথম পাতায় স্প্রে করা যায়। বর্ষজীবী সবজিতে ৩-৪ বার স্প্রে করা চলে। গোবর, খৈল ইত্যাদি জৈব সার ভালভাবে পচিয়ে তরলাকারে পাতায় প্রয়োগ করা যায়। জিংক সালফেট ও বোরিক এসিড ২.৫-৫.০ ভাগ দ্রবণ তৈরি করে পাতায় প্রয়োগ করা যায়।

উপরি-প্রয়োগ পদ্ধতি

সাধারণত দুই পদ্ধতিতে সবজি ক্ষেতে উপরিপ্রয়োগ করা হয়। একটি হচ্ছে জমি চাষের পর সার ছিটানো হয় এবং আরেকটি হচ্ছে অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে সার ছিটানো হয় এবং ছিটানোর পরে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

ছিটিয়ে সার প্রয়োগ অনেক সহজ এবং কম ব্যয়বহুল। তবে এ পদ্ধতিতে ফসফরাস ও পটাশ মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। গাছের নিকট গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে না। ভাল শিকড় না হওয়া পর্যন্ত গাছ দক্ষতার সাথে এ সার গ্রহণ করতে পারে না।

অন্যদিকে অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে সার প্রয়োগের কারণে বীজ বা গাছের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে শিকড়ের বিস্তৃতির দিকে খেয়াল রেখে সার প্রয়োগ করলে গাছ অধিক পরিমান সার শোষণ করতে পারে। ফলে ফলনও আসে বেশি।

সবজি চাষে সারের চাহিদা নিরুপণ

সবজির চাহিদা মোতাবেক সঠিক পরিমাণ অপেক্ষা কম সার ব্যবহার করলে ফলন কমে যাবে। অন্যদিকে বেশি সার ব্যবহারে সারের অপচয় হবে, খরচ বেড়ে যাবে, ফসলের গুণাবলি ও জমির উর্বরতা নষ্ট হবে, ফলন কমে যাবে। সারের চাহিদা পূরণের জন্য রাসায়নিক সারের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অন্তত ১০-২৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত।

বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান চাহিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

সবজির নাম	খাদ্যোপাদান কখন বেশি পরিশোষণ করে
ফুলকপি	ফসল তোলার পূর্বের ৪০ দিন
বাঁধাকপি	মাথা বাঁধার শুরু থেকে ৩০ দিন
শালগম	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
মুলা	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
গাজর	ঐ
বেগুন	ফসল ধরা শুরু থেকে ৭০ দিন
টমেটো	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
গোল আলু	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
মিষ্টি আলু	ঐ
শিম	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
মটরশুটি	ঐ
শসা	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
পেঁয়াজ	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
পালংশাক	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন

২০২৫

সার প্রয়োগ সম্পর্কিত সতর্কতা

১। কিছু সার ব্যবহারে বা মিশ্রণে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন-

ক) চুন পটাশ সারের সাথে মেশানো উচিত নয়।

খ) চুন, সুপার ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর সার, কম্পোস্ট ইত্যাদি কখনও একসাথে মিশানো উচিত নয়।

গ) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর সার, খামার সার কিংবা বিভিন্ন বিষ্ঠা সারের সাথে মিশানো যাবে না।

ঘ) ঝড়ো বাতাসের সময় বা ফসলের পাতা ভেজা অবস্থায় সার উপরিপ্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

ঙ) কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাঁচা গোবর সার মাটিতে প্রয়োগ করা হলে তার ১ মাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।

চ) প্রখর রোদের সময় বিশেষ করে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ছিটালে বেশির ভাগই নষ্ট হতে পারে।

ফার্টিগেশন পদ্ধতি

কঠিন বা তরল সার যখন সেচের পানির সাথে বৈজ্ঞানিক পন্থায় জমিতে প্রয়োগ করা হয় সে পদ্ধতিকে ফার্টিগেশন পদ্ধতি বলে।



চিত্র: ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে সবজি চাষ

ফার্টিগেশন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১। অধিক ফলনের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২। অল্প পরিমাণ সারকে সবজির মূলীয় অঞ্চলে খুব অল্প সময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

৩। সার এর অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

৪। সার ও পানির সমবন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৫। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

অসুবিধা

১। এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল।

২০২৫

২। গাছের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে সার বন্টন অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৩। এ পদ্ধতির জন্য পানির গুণগতমান ভাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ফার্টিগেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১। ভেনচুরি পাম্প

২। ফার্টিলাইজার ট্যাংক

৩। ফার্টিলাইজার ইনজেকশন পাম্প

ফার্টিগেশনের জন্য উপযোগী সবজি ফসল

টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, ঢেড়স, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, পালংশাক ইত্যাদি।

৩.২ সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, বৃদ্ধি, ফুল, ফল ও বীজ উৎপাদনে পানি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই চাহিদা অনুসারে পানি না পেলে সবজির ফলন হ্রাস পেতে থাকে। শীত মৌসুমে জন্মানো সবজির সংখ্যা বেশি। কিন্ত এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। গ্রীষ্মকালেও একই অবস্থা বিরাজ করে। অন্যদিকে বর্ষাকালে সেচের বদলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হয়।

৩.২.১ সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ সময় নির্ধারণ

চারা গজানো থেকে ফুল ধরা পযন্ত সবজির পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর চাহিদা কমতে থাকে। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সেচের সময় নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণত বৃষ্টি না হলে সবজির ফুল আসা পর্যন্ত জমিতে প্রতি ১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। তবে বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম বিধায় এ জাতীয় মাটিতে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। পানির অভাবে গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখা দেয়ামাত্র পানি সেচ দিতে হবে। তাছাড়া পানির অভাবে মাটি হালকা রং ধারণ করে বিধায় তখন সেচ দিতে হবে। পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা বেশি। এগুলোর শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় বেশি পরিমাণে ও ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন, শসা এবং টমেটোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পানির প্রয়োজন। গোলআলু, মুলা প্রভৃতির জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন থাকলেও নিয়ন্ত্রিত সেচ দিতে হবে। শিম ও কুমড়াজাতীয় এবং অন্যান্য বর্ষজীবী সবজি পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত সেচে ভাল ফলন দেয়।

সেচ পদ্ধতি

প্রধানত ৩টি পদ্ধতিতে সবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো

১। পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি: প্লাবন, নালা, থালা পদ্ধতিগুলো পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতির আওতাভুক্ত। এ পদ্ধতিতে দোন বা সেঁউতির সাহায্যে পুকুর, খাল বিল এবং নদী থেকে পানি তুলে অথবা গভীর এবং অগভীর নলকূপের সাহায্যে

ভূ-নিম্নস্থ পানি তুলে সেচ দেয়া হয়ে থাকে। সেচের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সহজতর ও সেচ খরচ কম পড়ে, পানির অপচয় হয় না এবং সেচের পর মাটি সহজেই কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। জমি সমতল না হলে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া কষ্টকর। নালা করে সেচ দেওয়ার সময় জমি একদিকে অল্প ঢাল করে তেরি করে নিলে সেচের পানির অপচয় কম হয়। আবার বেশি ঢালু হলে পানির সাথে মাটি ও গাছের খাদ্যোপাদান ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সবজির দুই সারি বা কেয়ারির মাঝে নালা করে পানি দেওয়া যায়। এতে সবজি গাছের গোড়ার মাটি রসালো হয়, মাটি ঝুরঝুর থাকে এবং কর্দমাক্ত হয় না।

২। নিম্ন পৃষ্ঠদেশে সেচ: এ পদ্ধতিতে সবজি গাছের শিকড়াঞ্চলে পানি পৌঁছে দেয়া হয়। এ কাজে ছোট ছিদ্রযুক্ত পাইপের সাহায্যে করা হয় বলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। এ পদ্ধতিতে মাটি কর্দমাক্ত হয় না এবং মাটিতে বায়ু চলাচল অব্যাহত থাকে।



৩। ঝরনা সেচ: এ পদ্ধতিতে পাইপের ভিতর দিয়ে পানি সরবরাহ করে বৃষ্টির মত ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এটি পানি সেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর সুবিধা হলো পানি সমভাবে বন্টন সম্ভব হয়।



চিত্র: বিভিন্ন ধরনের সেচ পদ্ধতি

৩.২.২ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বর্ষাকালে সবজি ক্ষেতে অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পেয়ে শিকড় অকেজো হয়ে পড়ে। গাছের নিচের পাতা লাল হয়ে ঝরে পড়তে থাকলে বুঝতে হবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। জলাবদ্ধতার কুফলগুলো হল -

১। মাটি পানিতে পূর্ণ থাকলে শিকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়।

২। শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

৩। মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে অপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং উপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

৪। গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রেট নাইট্রাইটে এবং সালফেট সালফাইডে পরিবর্তিত হয়। এগুলো গাছ গ্রহণ করতে পারে না।

৫। মাটির তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

৬। মাটির লবনাদি বিধৌত ও নি:সরণ হতে পারে না।

৭। জলাবদ্ধতার কারনে মশার বংশবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বাড়ে।

সুবিধামত নিষ্কাশন পদ্ধতি অবলম্বন করলে জলাবদ্ধতার হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে-

- নিষ্কাশন নালা তৈরি করা, বাঁধ নির্মাণ, পানির গতি পরিবর্তনের জন্য নালা তৈরি এবং উঁচু করে বেড তৈরি করা।
- ভারী কাদামাটি ধরনের হলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার এবং নদীবাহিত পলিমাটি প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৩ সবজি চাষে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সবজি বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছের যথাযথ বৃদ্ধি, ফুল ও ফলায়নের জন্য যে সমস্ত পরিচর্যা গ্রহণ করতে হয় সেগুলোকে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা বলা হয়। যথা-

৩.৩.১ কর্ষণ

প্রতিবার বৃষ্টি ও সেচের পর মাটির উপরিভাগ শুকিয়ে এলে মাটির উপরিভাগে শক্ত আস্তরণ পড়ে। ফলে মাটির অভ্যন্তরে বাতাস ও পানি চলাচল ব্যাহত হয়। এতে শিকড়ের মাধ্যমে গাছের শ্বসন ক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। কর্ষণের ফলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং আগাছা দমনও অনেক সহজ হয়। কর্ষণের জন্য কোদাল, আচড়া, নিড়ানি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৩.২ মালচিং বা আচ্ছাদন প্রয়োগ

মাটিতে রস ধারণ, আগাছা দমন ও মাটির চটা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য গাছের মধ্যবর্তী জায়গায় খড়কুটা, কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেয়াকে মালচিং বলে। জৈব পদার্থ বা কালো প্লাস্টিক ব্যবহার করে জমিতে মালচিং করা যায়। কালো প্লাস্টিকের আস্তরণ বেডের উপর দিয়ে তার উপর চারা রোপণ করা হয়। এতে মাটির রস সংরক্ষিত হয় এবং আগাছা দমন হয়।

মালচিং এর উপকারিতা

১। জৈব পদার্থের মালচিং পচে গিয়ে মাটিতে যুক্ত হয়।

২। মাটির ক্ষয় রোধ করা যায়।

৩। জৈব পদার্থের মালচিং মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।

৪। মাটির জমাট বাঁধা রোধ করে।

৫। মাটির রসের বাষ্পীভবন রোধ করা ও রস সংরক্ষণে সহায়তা করা।

৬। রঙিন প্লাস্টিকের চকচকে রংয়ের ঝলকানী দিয়ে অনেক অনিষ্টকারী পোকাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

৭। স্বচ্ছ প্লাস্টিক ফিল্মের মালচিং আগাছা দমনে সাহায্য করে।

মালচিং এর উপকরণ: জৈব পদার্থের মালচিং, যেমন- খড়, কচুরিপানা, আখের ছোবড়া, করাতের গুঁড়া, পুরনো পত্রিকার কাগজ ইত্যাদি।

৩.৩.৩ আগাছা দমন

ক্ষেতে কোন প্রকার আগাছা জন্মাতে দেয়া উচিত নয়। বাংলাদেশে মুথা, বড় চুচা, ভাদাইলা, শ্যামা, চাপড়া ঘাস, বথুয়া, নুনে, দুর্বা ইত্যাদি আগাছা দেখা যায়। এসব আগাছা দমন করতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে-

১। আগাছামুক্ত সবজি ফসলের বীজ ব্যবহার করা।

২। উত্তমরূপে ভূমিকর্ষণ করা।

৩। কেলি বা নালা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা।

৪। শস্য পর্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করা।

৫। নিড়ানী দেয়া অথবা কোপানো।

৬। আগাছা সমূলে উৎপাদন করতে হবে।

৭। ২-৪ ডি আগাছা নাশক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৩.৩.৪ গাছের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ

সব সময় জমিতে গাছের স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বাধিক ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে না গজানো চারা বা মরে যাওয়া চারার শূন্যস্থানে নতুনভাবে বীজ বপন বা চারা লাগাতে হয়। সকল বীজ গজানোর পর বা চারা রোপণের ৩-৫ দিন পর থেকে এ কাজ করতে হবে।

৩.৩.৫ চারাকে সূর্যালোক থেকে রক্ষা

কিছু সবজির চারা যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস, ওলকপি ইত্যাদি চারা লাগানোর পর কলা গাছের খোল বা কাগজের টুপি বানিয়ে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করতে হবে।

৩.৩.৬ চারা পাতলাকরণ

বপন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে জমিতে বীজ বপন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চারা দু'পাতা বিশিষ্ট হলে ঘন জায়গা হতে সাধারণত দুর্বল চারা উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হয়।

৩.৩.৭ সবজির পরাগায়ন

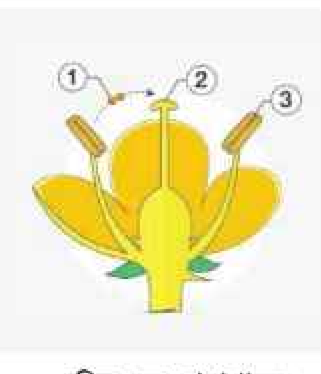
পুরুষ ফুলের পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থাপিত হলে তাকে পরাগায়ন বলা হয়। এই রেণু গর্ভমুন্ড থেকে গর্ভদন্ডের মধ্যে এক ধরনের কৈশিক বা সরু নলের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে পৌঁছে এবং সেখানে ডিম্বাণুর সাথে নিষিক্তকরণের বা মিলনের মাধ্যমে ফল ও বীজ গঠন শুরু করে। কাজেই সব ফলজাতীয় সবজি উৎপাদনে পরাগায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গাজর, ওলকপি, শালগম, বীট প্রভৃতি সবজির পরাগায়ন ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, আমরা এসব সবজির রুপান্তরিত মূল বা কান্ড খাই। পরাগায়ন সুষ্ঠুভাবে না হলে ফুল ঝরে যায় বা ফল নষ্ট হয়। তবে নিম্নোক্ত কারণেও ফুল ঝরে যায় বা ফল নষ্ট হয়-

১। জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া বা নাইট্রোজেন সার ব্যবহার
২। ছায়া জায়গায় সবজি চাষ করলে
৩। অত্যাধিক গরম আবহাওয়া থাকলে
৪। প্রবল বৃষ্টিপাত, খরা, সেচসংকট বা মাটিতে রস না থাকলে
৫। রোগ ও ফলের মাছি পোকার আক্রমণ।

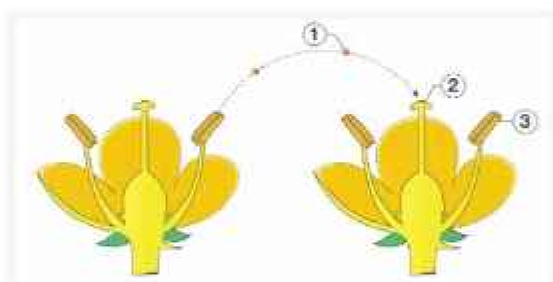
পরাগায়নের ধরন: পরাগায়ন প্রধানত দুভাবে হতে পারে- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। অধিকাংশ গাছেই পরাগায়ন প্রাকৃতিক উপায়ে, যেমন-পোকামাকড় (মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, সিরফিড মাছি), বাতাস ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটে। আবার এমন কিছু কিছু গাছ রয়েছে যাদের পরাগায়ন কৃত্রিমভাবে ঘটাতে হয়; প্রাকৃতিক পরাগায়নের উপর নির্ভর করলে এ ক্ষেত্রে ফলন কমে যায়। যেমন- কুমড়াজাতীয় গাছ।

পরাগায়নের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সবজিসমূহকে ক) স্বপরাগায়িত ও খ) পরপরাগায়িত এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক) স্ব-পরাগায়িত সবজি: যেসব সবজির একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ থাকে এবং ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু বাহিত হয়ে একই ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হওয়ার মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে তাদেরকে স্বপরাগায়িত সবজি বলে। স্বপরাগায়িত সবজির পরাগায়ন ঘটার জন্য কোন বাহক পোকা বা মাধ্যমের দরকার হয় না। যেমন- মটরশুটি, টমেটো, শিম, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি।



১. পরাগরেণু
২. গর্ভমুন্ড
৩. পরাগধানী



চিত্র : স্ব পরাগায়ন

চিত্র : পর-পরাগায়ন

খ) পর পরাগায়িত সবজি: সে সব সবজির একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ না থাকায় পরাগায়নের জন্য স্ত্রী ফুলের অন্য একটি পুরুষ ফুলের প্রয়োজন হয় তোদেরকে পরপরাগায়িত সবজি বলে। পরপরাগায়িত সবজির পরাগায়ন ঘটার জন্য বাহক পোকা বা বাতাস দরকার হয়। এক্ষেত্রে একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদাভাবে থাকতে পারে, আবার ভিন্ন ভিন্ন গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটতে পারে। একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটলে সেসব গাছকে বলে সহবাসী (Monoecious) গাছ। যেমন-মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা ইত্যাদি। আবার ২০২৫

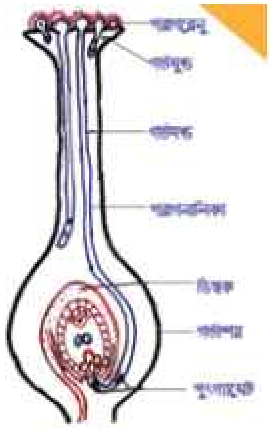
যেসব সবজির স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা তাদেরকে ভিন্নবাসী (Dioecious) গাছ বলে। যেমন- পটল, কাঁকরোল।

কৃত্রিম পরাগায়ন: কৃত্রিম পরাগায়ন হলো প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে অন্যভাবে পরাগায়ন নিশ্চিত করা। সাধারণত কৃষকেরা হাত দ্বারা কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। এজন্য একে হাত পরাগায়নও বলা হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটাতে হলে প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল চেনা প্রয়োজন। সাধারণভাবে যেসব ফুলের গোড়ায় বোটার উপরে ফলের একটি ছোট গঠন থাকে যাকে গর্ভাশয় বলে, সেসব ফুলই স্ত্রী। আর যেসব ফুলের গোড়ায় কোন গর্ভাশয় বা এ ধরনের কোন গঠন থাকে না সেগুলো পুরুষ ফুল।

কৃত্রিম পরাগায়ন বা হাত পরাগায়ন পদ্ধতি: কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য পুরুষ ফুলের পরাগরেণু সংগ্রহ করে বা পুরুষ ফুল নিয়ে তার পরাগধানী স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ছোঁয়াতে বা হালকা করে ঘষতে হয়। কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটার সময়, পরাগ বিদারণ কাল এবং পরিবেশগত উপাদানসমূহ বিবেচনা করতে হয়। সাধারণত কুমড়াজতীয় সবজির ফুল সকালেই ফোটে। শসা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি সবজির ফুল মার্চ মাসে ফোটে সকাল ৬ টার মধ্যেই। কিন্তু এপ্রিলে ৮ টা পর্যন্ত ফুটতে দেখা যায়। আবার লাউ ও ঝিঙা সকালের পর দুপুর পর্যন্তও ফোটে ও ফল ধারণ ঘটে। কিন্তু পটল ও চিচিঙ্গার ফুল ফোটা ও ফল ধারণ অবশ্যই খুব ভোরে ঘটে এবং এ দুটি সবজির ফুল ফোটা ও পরাগ বিদারণ বা ফেটে যাওয়া রাতের তাপমাত্রা দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়। পটল ও কাঁকরোলের ক্ষেত্রে জমিতে অন্তত ১০-১৫ শতাংশ পুরুষ গাছ রাখতে হয়। তাহলে কৃত্রিম পরাগায়নের উপযোগী পুরুষ ফুল প্রতিদিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হলে সকালবেলায় একই সময়ে ফোটা পুরুষ ও স্ত্রী ফুল বেছে নিতে হয়। ভোরে একাজটি করা ভালো। পুরুষ ফুলটি গাছ থেকে বোঁটাসহ ছিঁড়ে তার পাপড়ি ফেলে দিতে হয়। এ অবস্থায় বোঁটার উপর শুধু পরাগদন্ডটি দাঁড়িয়ে থাকে। এসব কাজ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরাগদন্ডের মাথায় যে পরাগধানী ও হলুদ গুঁড়ো গুঁড়ো পরাগরেণু থাকে তা যেন নষ্ট না হয় এবং কোন প্রকার ঘষা না লাগে। এরুপ একটি পরাগদন্ড নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে হালকা করে ঘষে দিতে হয়।

এতে গর্ভমুন্ডের আঠালো পদার্থে পরাগরেণু লেগে যায় ও পরাগায়ন ঘটে। প্রজাতিভেদে এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-১০টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন ঘটানো যায়। কাঁকরোলের ক্ষেত্রে স্ত্রী ফুলের চেয়ে পুরুষ ফুল ফুটতে সময় বেশি লাগে। গাছ গজানোর পর সাধারণত ৩০-৬০ দিন পর স্ত্রী ফুল ফোটে এবং পুরুষ ফুল ফোটে তারও ১০-১৫ দিন পর। এজন্য কন্দ রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে পুরুষ গাছের কন্দ বা মোথা লাগাতে হয়।



চিত্রঃ নিষেক প্রক্রিয়া

কৃত্রিম পরাগায়নের ধাপ সমূহ

১ম ধাপ-

পুরুষ ও স্ত্রী ফুল চিহ্নিত করা।

২য় ধাপ-

উপযুক্ত পুরুষ ফুল (কিছুটা অফুটন্ত) সংগ্রহ করে পাপড়ি ছিড়ে পরাগধানী অথবা তুলি দিয়ে পুরুষ ফুল হতে পরাগরেণু সংগ্রহ করা।

৩য় ধাপ –

এবার সংগ্রহকৃত পরাগরেণু স্ত্রী ফূলের গর্ভমুন্ডে আলতোভাবে ঘষে দিতে হবে, অথবা তুলি বা কটন বাড ব্যতীত সরাসরি পুরুষ ফুলের পরাগধানী সংগ্রহ করে স্ত্রী ফূলের গর্ভমুন্ডে আলতোভাবে ঘষে দিলেও পরাগায়ন সম্পন্ন হলে ফল টিকে যাবে বা কোন ফল পচে বা ঝরে পড়বে না।



চিত্র: মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন

৩.৩.৮ অন্যান্য পরিচর্যা

ফলন বৃদ্ধি এবং এর গুণগতমান রক্ষা করার জন্য কতগুলো সবজির বেলায় বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। যেমন-

ক) লতানো প্রকৃতির সবজির বেলায় বাউনি ও মাচা তৈরিকরণ

খ) টমেটোর বেলায় অঙ্গ ছাটাই ও খুঁটি দেয়া

গ) গোলআলুর জন্য গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ইত্যাদি।

ঘ) টমেটোর উপরের দিকে বেয়ে উঠার কোন ক্ষমতা না থাকায় প্রতিটি গাছের পাশে আলাদাভাবে ঠেস দিতে হয়।

৩.৪ সবজি পর্যায় ও অন্তর্বর্তী চাষাবাদ

৩.৪.১ সবজি পর্যায়: প্রতি বছর একই জমিতে একই ফসল না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল করাকে সবজি পর্যায় বলে। প্রতি মৌসুমে একই ফসল চাষ না করে চাষযোগ্য সবজিকে চার ভাগে ভাগ করে চার মৌসুমে চাষের ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়।

প্রথম মৌসুমে: পাতা জাতীয় শস্য চাষ করা উচিত। কারণ, এরা নাইট্রোজেন চাহিদা যুক্ত। যেমন- লেটুস, পালং, ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ও অন্য আরো পাতা জাতীয় সবজি।

দ্বিতীয় মৌসুমে: ফসফরাস চাহিদাযুক্ত ফসলচাষ করা উচিত; এদের মধ্যে থাকতে পারে টমাটো, বেগুন, মরিচ, কমড়া জাতীয় সবজি- যেমন মিষ্টি কমড়া, চাল কমড়া, তরমুজ, ঝাঙ্গা, চিচিঙ্গা, শসা ও ক্ষিরা ইত্যাদি।

তৃতীয় মৌসুমে: পটাশ পছন্দকারী ফসল চাষ করা যায়, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, মুলা, শালগম ইত্যাদি।

চতুর্থ মৌসুমে: মাটি বন্ধনকারী ও পরিষ্কারকরণ ফসল চাষ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে লিগিউম জাতীয় ফসল বেশি ভালো। কেননা, এরা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন আহরণ করে মাটিতে যুক্ত করতে পারে।

অর্থাৎ পাতা জাতীয় সবজি চাষের পর ফল জাতীয়, এরপর মূল জাতীয় এবং

শেষ মৌসুমে: লিগিউম জাতীয় শস্য চাষ করলে মাটির পুষ্টি তথা সার যথাযথভাবে ব্যবহার হয়। একই জাতীয় ফসল চাষ করলে মাটিতে বিশেষ ধরনের পুষ্টির অভাব হয় ও সমস্যা দেখা দেয়, এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন রকমের ফসল চাষ বেশি লাভজনক। আমরা জানি, রাইজোবিয়াম বা নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাক্টেরিয়া মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

৩.৪.২ অন্তর্বর্তী চাষাবাদ

ক) অনুক্রমিক চাষ: একই জমিতে পরপর দুই বা ততোধিক শস্য বপন বা রোপণ করা।

খ) সাথী ফসলের চাষ: এ পদ্ধতিতে একটি শস্য মাঠে থাকতেই আরেকটি শস্য ঐ জমিতে রোপণ করে দিতে হবে। যেমন-ঢেঁড়সের মাঝে ফ্রেঞ্চবীনের চাষাবাদ।

গ) মিশ্র চাষ: এ পদ্ধতিতে একই জমিতে একই সাথে সাধারণত দুইটি বা ততোধিক শস্য রোপণ করা হয়। যেমন- ঢেঁড়সের সাথে ডাঁটা বা মরিচের চাষ।

ঘ) শিম জাতীয় ফসল জন্মিয়ে বা সবুজ সারের চাষ করে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়। যে সমস্ত ফসল জৈব পদার্থ কম যোগ করে (যেমন- লেটুস, পেঁয়াজ, মুলা, পালংশাক ইত্যাদি) সেগুলোর পর সেই জমিতে এমন সবজি চাষ করতে হবে যেগুলো আবার অধিক জৈব পদার্থ যোগ করে। যেমন- শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৩.৫ শাক-সবজির বালাই দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

আই.পি.এম এর ইংরেজি পূর্ণরুপ হচ্ছে 'Integrated Pest Management' যার বাংলা অর্থ 'সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা'। আই.পি.এম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি দমন ব্যবস্থা যাতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য সমন্বিতভাবে কয়েকটি দমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আই.পি.এম এর অর্থ পোকা নিধন করে পোকাবিহীন বাগান নয় বরং পোকামাকড়ের আক্রমণকে কমিয়ে আনা যাতে ফসল উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

আই.পি.এম পদ্ধতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। পরিচর্যা পদ্ধতি

ক) জমি কর্ষণ: ভালভাবে জমি কর্ষণ করলে পোকার ডিম, কীড়া (লার্ভা), পুত্তলি (পিউপা), রোগজীবাণু ইত্যাদি মাটির উপরে চলে আসে। ফলে রৌদ্রে এগুলো নষ্ট হতে পারে এবং পাখি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এগুলো ধ্বংস হতে পারে।

খ) ফসল বপন/রোপণ সময় ঠিক করা: ফসল বপন, রোপণের সময় পরিবর্তন করে কিছু পোকা দমন করা যায়।

গ) প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা: প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করে পোকা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ঘ) শস্য চক্র: শস্য চক্র অনুসরণ করে পোকা নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

ঙ) সার প্রয়োগ: পরিমিত সার প্রয়োগে গাছের প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়ে, ফলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

চ) সেচ: পরিমিত সেচ প্রয়োগে গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

২। যান্ত্রিক দমন: বিভিন্ন যন্ত্র যেমন-জাল, পাত্র ফাঁদ, আলোর ফাঁদ এবং আঠার ফাঁদ ব্যবহার করে কিছু পোকা দমন করা যায়। ফাঁদ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পোকা এসে ফাঁদে আটকা পড়ে এবং সহজেই পোকা মারা যায়। যেমন- পাত্র ফাঁদ- একটি পাত্রে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রেখে তার উপরে একটি জ্বলন্ত হারিকেন স্থাপন করে অন্ধকার রাত্রে ফসলের জমিতে রেখে দিলে পোকা উড়ে এসে পোকা আলোর নিকট আসবে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে পাত্রে রাখা কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে পড়ে মারা যাবে।

৩। ভৌত পদ্ধতি: হাত দ্বারা ধরে লেদা পোকা, জাব পোকা, বিছা পোকা, ডিমের গাদা ইত্যাদি হাত দিয়ে দমন করা যায়।

৪। জৈবিক পদ্ধতি: এটি ৩ ধরনের। যেমন-

ক) পরভোজী পোকা, যেমন-লেডি বার্ড বিটল, বোলতা, ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পরভোজী পোকা দ্বারা আক্রান্ত পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করা।

খ) পোকাবিতাড়নকারী গাছ, যেমন- ধনিয়া, বগামেডুলা, বিষকাঠালী ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আক্রমণকারী পোকা জমিতে না আসার জন্য ব্যবস্থা করা।

গ) গাছপালা থেকে তৈরি ঔষুধ ব্যবহার করে আক্রান্ত পোকা দমন।

৫। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন ১-৪ নম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি পোকার আক্রমণ দমন না হয় তখন রাসায়নিক কীটনাশক কিংবা রোগনাশক ব্যবহার করে পোকা ও রোগ দমন করতে হবে। মনে রাখতে হবে সঠিক রাসায়নিক কীটনাশক নির্বাচন, সঠিক মাত্রা ও সঠিক পরিমানে ব্যবহার এবং কোম্পানীর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি আক্রান্ত জমিতে যতবার ব্যবহারের নির্দেশনা থাকে ঠিক সেভাবে ততবার ব্যবহার করা ভালো।

জৈব কীটনাশক: যে কীটনাশক গাছের লতা পাতা, বীজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় তাকে জৈব কীটনাশক বলে। এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং গ্রামে মহিলারা এটি সহজেই তৈরি করে পোকা দমনে ব্যবহার করে। যেমন-

২০২৩

ক) নিম পাতা: ১ ভাগ নিম পাতা ৮ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ করা পানি ঠান্ড করে গাছে স্প্রে করতে হবে। এটা সব ধরনের পোকা দমনে ব্যবহার করা যায়।

খ) বিষকাটালী পাতা: ১ ভাগ বিষ কাটালী পাতা পিষে ৮-১০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ছেকে সেটা গাছে স্প্রে করে জাব পোকা, মাছি পোকা, রেড পাম্পকিন বিটল ইত্যাদি মারা যায়।

৩.৫ সবজি সংগ্রহ, বাছাইকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ

সবজি সংগ্রহ পর্যায়: সবজির স্বাদ, পুষ্টিমান এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কখন সবজি সংগ্রহ করতে হবে। তবে সবজি মোটামুটি পরিপক্ক হয়ে আসলে সবজি সংগ্রহ করতে হয়। বেশি কচি অবস্থায় সবজি সংগ্রহ করলে সে সবজি নষ্ট হয়ে যায়।

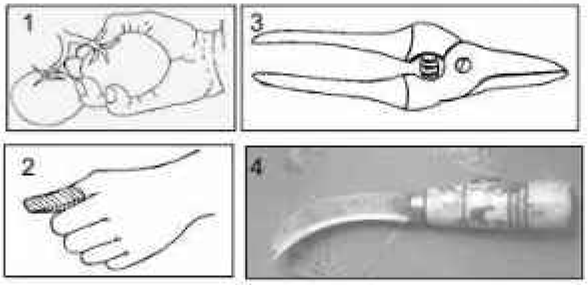
সবজির পরিপক্কতা: বিভিন্ন অবস্থায় সবজি সংগ্রহ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে খাওয়ার উপযোগী পরিপক্কতা, শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিপক্কতা।

ক) খাওয়ার উপযোগী পরিপক্কতা: সবজি যখন সর্বোৎকৃষ্ট স্বাদ, আকার, রং ও অন্যান্য গুণাগুণ অর্জন করে। বিভিন্ন সবজির বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে খাওয়ার উপযোগী হয়। কাঁচা অবস্থায় বা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার আগেই শসা, শিম, ঢেঁড়স খাওয়ার উপযোগী হয়। এ সমস্ত সবজির বেলায় পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয় ফলের রং ও আকৃতি দেখে। গোলআলুর বেলায় গাছের উপরিভাগ শুকি য় এলে এবং আলুর খোসা সহজেই ছাড়ানো গেলে আলু খাওয়ার উপযোগী হয়। পেঁয়াজ ও রসুন গাছের উপরিভাগ শুষ্ক হয়ে পড়লে সংগ্রহ করতে হবে।

খ) শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতা: সবজি শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতায় তখনই পৌঁছে যখন সবজির উৎপাদিত বীজ পরিপক্ক হয়ে অংকুরোদগম ক্ষমতা অর্জন করে। সাধারণত বীজ উৎপাদনের জন্য সবজি সংগ্রহ করা হয়। বেশিরভাগ সবজি যেমন- বেগুন, ফুলকপি, লেটুস ইত্যাদি শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতায় খাওয়ার অনুপযোগী হয়। শিম, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি সবজি খাওয়ার উপযোগী ও শারীরবৃত্তিক উভয় পরিপক্কতায় খাওয়া যায়।

গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিপক্কতা: সবজিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আচার প্রস্তুত করার জন্য ৭-৮ সে.মি. লম্বা ও আঙ্গুলের ন্যায় ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কচি শসা খাওয়ার উপযেগী পর্যায়ে আসার আগেই সংগ্রহ করতে হবে। আবার টমেটোর রস বা সস তৈরি করতে টমেটোকে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে।

সবজি সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি: অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাঠ থেকে সবজি সংগ্রহ করতে হবে যাতে করে শারিরীক ক্ষত কম হয় এবং পণ্যের গুনগতমান বজায় থাকে। সবজি সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমে কিছু কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শ্রমিক খরচ কম হয়, কাজের গতি বাড়ে এবং পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রন করা যায়। সবজি সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমের সময় কর্মীদের নিরাপত্তামূলক পোষাক (এপ্রোন) পরিধান করা উচিত যা গাছের কাঁটা বা কষ থেকে রক্ষা করবে। এছাড়া মরিচের রস (Sap) ত্বকে জ্বালাপোড়া বা এলার্জী সৃষ্টি করতে পারে।



১) নখ দ্বারা হ্যান্ডপিকিং; ২) আঙ্গুলে নিপার পড়া ৩) ক্লিপার ৪) হারভেস্টিং চাকু



৫) মসৃন তলাবিশিষ্ট ফসল সংগ্রহ পাত্র; ৬) নিরাপদ এপ্রোন পরিহীত সবজি সংগ্রাহকারী

চিত্র: সবজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কতিপয় উপকরণ

সবজি সাধারণত ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় সংগ্রহ করতে হবে। শাকসবজি জাতীয় যেমন- লেটুস, পালংশাক ইত্যাদি অধিক তাপমাত্রায় বিশেষ করে দুপুর বেলায় সংগ্রহ করলে শ্বসন, প্রস্বেদন এবং অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলার ফলে ওজন কমে যায়। ফল জাতীয় সবজি, যেমন- টমেটো, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি দুপুর বেলায়ও সংগ্রহ করা যায়। টমেটো, বেগুন, শশা এবং অন্যান্য ফলজাতীয় সবজির বোঁটা কর্তনের মাধ্যমে ফলকে গাছের কান্ড থেকে পৃথক করা হয়। ফল এমনভাবে টেনে ছেঁড়া যাবে না যাতে করে কান্ডের শেষ প্রান্ত (Stem end) ফলের সাথে সংযুক্ত থাকে। ফল টেনে ছিড়লে অনেক সময় ফলবৃন্ত উঠে আসে এবং মাতৃগাছের বাকল ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা পরবর্তীতে রোগাক্রান্ত হয়, যার ফলে গাছ থেকে পানি ও শ্বসনীয় গ্যাসসমূহ বের হয়ে যায়। নিচে সবজি সংগ্রহের পদ্ধতি ছক আকারে প্রদর্শিত হল-

সবজির নাম	সংগ্রহের পদ্ধতি
বেগুন, শসা, কুমড়া ইত্যাদি	ধারালো ছুরি দিয়ে গাছের বোঁটা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
গিমাকলমি, ডাটা, লালশাক	পুরো গাছটি শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে।
পুঁইশাক, লাউয়ের ডগা	গাছের অংশ কেটে সংগ্রহ করতে হবে।
টমেটো, মরিচ, শিম	হাত দিয়ে তুলে সংগ্রহ করতে হবে।

সবজি সংরক্ষণ: অধিকাংশ সবজিতে পানির পরিমাণ ৮০-৯০ ভাগ। বাংলাদেশে ভালভাবে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর সবজি নষ্ট হয়। সবজির এক চতুর্থাংশ ফেলে দিতে হয়।

সংগ্রহোত্তর গুণাগুণ বজায় রাখতে করণীয়

১। পরিষ্কারকরণ: মাঠে থাকা অবস্থায় এবং সংগ্রহের সময় সবজির গায়ে ধুলাবালি লাগতে পারে। এজন্য সংগ্রহের পরপরই পরিষ্কার পানিতে সবজি ধুয়ে নিতে হবে।

২। ছাঁটাইকরণ: নিকটবর্তী বা দূরের বাজারে প্রেরণেআগে আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে পাতা জাতীয় সবজির মূল ও নিম্নাংশের বয়স্ক পাতা ছাঁটাই করতে হবে। খুব ধারালো ছুরি দিয়ে ছাঁটাই করা উচিত।

৩। বাছাইকরণ: সবজির আকার আকৃতি, বর্ণ, পরিপক্কতা অনুসারে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে গ্রেডিং করতে হবে। মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, আলু মাঠে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় (২০-৪০° সে.) এবং উষ্ণ আর্দ্রতায় (কমপক্ষে ৮০%) কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহোত্তর সবজির পরিচর্যা

সঠিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সবজি হ্যান্ডিলিং করলে ক্ষতি পরিমাণ কম হয় এবং পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ করা যায়।

১. মাঠ থেকে সংগৃহীত সবজিসমূহ প্লাষ্টিক ক্রেটে রাখতে হবে। এতে করে বাঁশের ঝুঁড়ির তুলনায় পণ্যের ক্ষতি অনেক কম হবে।
২. একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন পরিপক্কতার সবজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিপক্কতার পর্যায় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ পাত্র ব্যবহার করতে হবে।
৩. সংগ্রহের পর সবজিকে উম্মুক্ত মাঠে রোদের মধ্যে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখা যবে না। এতে করে উক্ত সবজি থেতে দ্রুত পানি বের হয়ে নেতিয়ে পড়বে এবং ক্ষতিকর জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনাও খুব বেশী থাকে।
৪. মাঠ থেকে সংগৃহীত সরিষা শাক বা চাইনিজ কপিকে যদি রৌদ্রে ৩০ মিনিট রাখা হয় তবে তা সাময়িকভাবে নেতিয়ে পড়ে কিন্তু সংগ্রহোত্তর পরিচর্যার সময় ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। পরবর্তীতে এই সবজিগুলোকে ধৌতকরণের সময় ময়লা দ্রব্যসমূহ অপসারিত হওয়ার পাশাপাশি পুনরায় পানি পেয়ে সজিব হয়ে উঠে।
৫. একই ভাবে ক্যাম্বোডিয়াতে মাঠ থেকে সংগ্রহ করার পর বাঁধাকপিকে এক ঘন্টা রোদে রাখা হয়। এতে বাঁধাকপির বোঁটার কর্তিত তল শুকিয়ে যায় যা নরম পঁচা রোগের ব্যাকটেরিয়াকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।
৬. বাঁধাকপিকে ধৌত করা যাবে না। এজন্য প্যাকেজিং এর পূর্বে ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে ।
৭. উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা থাকলে মাঠ পর্যায়েই সবজির বাঁছাইকরণ, প্যাকেজিং এবং ট্রাকে পণ্য তোলা সম্ভব। সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং এবং বাজারে প্রেরণের জন্য পরিবহনের পণ্য উত্তোলনের কাজগুলো মাঠেও সম্পাদন করা যায়।

প্যাকেটজাতকরণ: বাংলাদেশে সবজির প্যাকেটজাতকরণ বা মোড়কীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূরে পাঠাতে বা অনেকক্ষণ সবজি সংরক্ষণের জন্য মোড়কীকরণ করা আবশ্যক। কিছু সংখ্যক সবজি সংগ্রহের পরপরই দ্রুত পানি পরিত্যাগ করে এবং নেতিয়ে পড়ে। বিভিন্ন শাক, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, দেশি শিম, লেটুস,

ধনিয়া পাতা ইত্যাদি এভাবে মোড়কজাত করতে হবে। দূরের বাজারে পরিবহনের সময় সবজিতে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত প্লাস্টিক, কাঠ, বাঁশের খাচা, অথবা কার্ডবোর্ডের বাক্সে সবজি বাজারজাতকরণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ: সবজি সংগ্রহ করার পর কিছু কিছু প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। টমেটো সংগ্রহ করে আচার, জ্যাম, জেলি, কেচাপ তৈরি করা যায়। এভাবে এগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। আবার মূল্য সংযোজনের ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। গোলআলু থেকে চিপস তৈরি করে অতিরিক্ত আলুর নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পচনশীল পণ্য হওয়ায় শাকসবজি দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। শাকজাতীয় পণ্যগুলো দ্রুত বাজারে নিতে হবে। পুরো পরিপক্ক বা বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে মোটামুটি কাংখিত সাইজের হলেই বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাজা সবজি বাজারে দেয়া যাবে চাহিদাও তত বেশি । প্রতিকূল অবস্থা বা আবহাওয়া থেকে সবজিকে রক্ষা করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- ফল জাতীয় সবজি চাষের জন্য বেশি আলোর দরকার হয়। শাক ও মূলজাতীয় সবজি কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি ছায়াতেও ভালোভাবে জন্মাতে পারে।
- দো-আঁশ মাটি সবজির জন্য অতি উত্তম।
- জমি তৈরির সময় সার প্রয়োগকে মৌল প্রয়োগ বলে।
- কাণ্ডজাতীয় সবজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে, লিগুমিনাস জাতীয় সবজি অর্থাৎ শিম পরিবারের সবজি ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে এবং মূল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও পটাশ পছন্দ করে।
- ১.০ – ১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকেলে প্রয়োগ করা যায়।
- সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অন্তত ১০-২৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত।
- কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাঁচা গোবর সার মাটিতে প্রয়োগ করা হলে তার ১ মাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।
- পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা বেশি।
- ঝরনা সেচ পানি সেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর সুবিধা হলো পানি সমভাবে বন্টন সম্ভব হয়।
- কর্ষণের ফলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং আগাছা দমনও অনেক সহজ হয়।
- সকল বীজ গজানোর পর বা চারা রোপণের ৩-৫ দিন পর থেকে গাছের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
- একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটলে সেসব গাছকে বলে সহবাসী (Monoecious) গাছ। যেমন-মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা ইত্যাদি। আবার যেসব সবজির স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা তাদেরকে ভিন্নবাসী (Dioecious) গাছ বলে। যেমন- পটল, কাঁকরোল।
- লতা জাতীয় সবজি আবাদের জন্য স্থায়ী মাচার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

- শসা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি সবজির ফুল মার্চ মাসে ফোটে সকাল ৬ টার মধ্যেই। কিন্তু এপ্রিলে ৮ টা পর্যন্ত ফুটতে দেখা যায়। আবার লাউ ও ঝিঙা সকালের পর দুপুর পর্যন্তও ফোটে ও ফল ধারণ ঘটে। কিন্তু পটল ও চিচিঙ্গার ফুল ফোটা ও ফল ধারণ অবশ্যই খুব ভোরে ঘটে।
- কাঁকরোলের ক্ষেত্রে স্ত্রী ফুলের চেয়ে পুরুষ ফুল ফুটতে সময় বেশি লাগে। গাছ গজানোর পর সাধারণত ৩০-৬০ দিন পর স্ত্রী ফুল ফোটে এবং পুরুষ ফুল ফোটে তারও ১০-১৫ দিন পর।
- পরভোজী পোকা, যেমন-লেডি বার্ড বিটল, বোলতা, ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই, ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পরভোজী পোকা দ্বারা সবজির আক্রান্ত পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করা।
- শাকসবজি জাতীয় যেমন- লেটুস, পালংশাক ইত্যাদি অধিক তাপমাত্রায় বিশেষ করে দুপুর বেলায় সংগ্রহ করলে শ্বসন, প্রস্বেদন এবং অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলার ফলে ওজন কমে যায়।
- গ্রেডিং করার পর মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, আলু মাঠে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় (২০-৪০° সে.) এবং উষ্ণ আর্দ্রতায় (কমপক্ষে ৮০%) কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সবজি চাষে বিভিন্ন সারের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি ছবি দেখে সারের নাম এবং এতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান উল্লেখ কর।

ক্র/নং	সারের নাম	সারের ছবি	পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার
১			
২			

৩			
৪			

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে তুমি শাকসবজি কিভাবে উৎপাদন করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা কিভাবে শাকসবজি উৎপাদন করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কিভাবে জমি ও মাটি প্রস্তুত, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ও নিষ্কাশন অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা রোগবালাই দমন এবং সবজি সংগ্রহ,বাছাইকরণ, পক্রিয়াজাত করণ ও বাজারজাতকরণ বিষয় সম্পর্কে তোমার সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে কি বলে?

২। ফুল ও ফল জাতীয় সবজি কি কি পুষ্টি উপাদান পছন্দ করে।

৩। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন।

৪। টমেটো, বেগুন কত ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।

৫। অম্লত্ব কমানো ও বাড়ানোর জন্য কি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

৬। জুলি পদ্ধতি কি?

৭। সার প্রয়োগের ২টি পদ্ধতি লিখ

৮। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার কত ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত?

৯। চুন কোন সারের সাথে মিশানো উচিত নয়।
১০। সবজি ক্ষেতে সেচ প্রধানত কয় পদ্ধতি দেওয়া হয়।
১১। মালচিং কি?
১২। পরাগায়নের ধরন কি কি ?
১৩। IPM- এর পূর্ণরূপ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শাক-সবজি চাষের জন্য কি ধরণের মাটি উপযোগী?
২। সার কাহাকে বলে? ৫টি রাসায়নিক সারের নাম লিখ।
৩। জৈব সারের গুরুত্ব লিখ।
৪। ফার্টিগেশন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।
৫। সবজি চাষে জলাবদ্ধতার কুফলগুলো লিখ।
৬। মালচিং এর উপকারিতা সমূহ লিখ।
৭। ফুল ঝরা বা নষ্ট হওয়ার কারণগুলো লিখ।
৮। সহবাসী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদ কাহাকে বলে।
৯। সবজি চাষে শস্য পর্যায় কৌশল বর্ণনা কর।
১০। জৈব বালাইনাশক কাহাকে বলে? ২টি জৈব বালাইনাশকের নাম লিখ।
১১। সংগ্রহোত্তর গুণাগুণ বজায় রাখতে করণীয় কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাক-সবজির জমি প্রস্ততকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
২। সার প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩। সবজি চাষে বিভিন্ন প্রকার সেচ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪। পরাগায়ন কাহাকে বলে? কিভাবে কৃত্রিম পরাগায়ন করা হয়?
৫। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? শাক-সবজির বালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জব ৩.১: সবজি বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- বীজের অংকুরোদগম হারের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- অংকুরোদগম হার সম্পর্কিত সূত্রটি লিখতে পারবে।
- মাটির পাত্র, কলার খোল, ভিজা চট ও পেট্রিডিসে সবজি বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৪. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৫. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

সুস্থ চারা উৎপাদনক্ষম বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হারকে অংকুরোদগম ক্ষমতা বলে। ফসল উৎপাদনে ভালমানের বীজ ব্যবহার করা হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ ভাল কিনা তা অংকুরোদগমের হার দেখে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট নিয়মে চারা গজিয়ে সুস্থ চারা গণনা করে এ হার নির্ণয় করা যায়। বীজ অংকুরোদগম বা গজানোর হার বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

বীজের অংকুরোদগম হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো

$$\text{অংকুরোদগমের শতকরা হার (Germination percentage)} = \frac{\text{মোট গজানো বীজের সংখ্যা}}{\text{গজানোর জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \%$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাটির পাত্র, ২। কলার খোল, ৩। ভিজা চট, ৪। পেট্রিডিস, ৫। কেচি/চাকু, ৬। পানি, ৭। ব্লটিং পেপার, ৮। সবজির বীজ, ৯। খাতা কলম।

কাজের ধারা

১) মাটির পাত্র পরিমাণ মত মাটি বা ধুলা দ্বারা ভর্তি করতে হবে।
২। কলার খোল: কলার পাতার বোঁটার দিকটার মোটা অংশে ১ ফুট পরিমাণ টুকরো করে কেটে নিতে হবে।
৩। ভেজা চট: ৩০ বর্গ সেমি পরিমাণ চট টুকরা করে কেটে নিতে হবে। ২০২৫

৪। পেট্রিডিস: পেট্রিডিসের ভিতরের তলায় ব্লটিং পেপার (চোষ কাগজ) বিছিয়ে নিতে হবে এবং চট ও ব্লটিং পেপারে অল্প অল্প পরিমান পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে নিতে হবে।

৫। এরপর বীজ লট হতে নমুনা বীজ সংগ্রহ করে সেখান হতে কোনরুপ পক্ষপাতিত্ব না করে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০০টি বীজ আলাদা করে নিতে হবে।

৬। ১০০টি নমুনা বীজ মাটির পাত্রে সারি করে বসায়ে আলো-বাতাসযুক্ত ছায়া স্থানে বসাতে হবে ও প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অল্প পানি দিতে হবে।

৭। কলার ডাঁটা বা কান্ড বা পাতার বোঁটার মোটা অংশের ১ দিক হতে বাঁশ ফালি করা বা ফাঁড়ার ন্যায় সমান্তরালভাবে দুই পাশ হতে ফাঁড়তে হবে। এতে মাঝখানের অংশ দন্ডের ন্যায় থেকে যাবে।

৮। কলার ডাঁটার দুই দিক হতে প্রায় ২০ সে.মি. পরিমাণ করে কাটা ফালি ২টি দুদিকে ভাঁজ করতে হবে, ঠিক যেভাবে কলা ছিলা হয়।

৯। কলার ডাঁটার ভিতরের দন্ডের খাঁজে খাঁজে ১০০টি বীজ সাজায়ে ফালি করা অংশ ২টি সোজা করে নিলে বীজ ঢেকে যাবে। এখন ডাঁটাটি সূতা/চিকন সূতলি দিয়ে পেঁচায়ে বেঁধে ঠান্ডা ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিতে হবে।

১০। চটটি বিছিয়ে একপাশে সারি করে ১০০টি বীজ সাজাতে হবে এবং একটা কাঠি চটের মাথায় ধরে আস্তে আস্তে চটটি কাঠির সাথে রোল করে পেচিয়ে নিয়ে ঠান্ডা ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিতে হবে। চটটি শুকায়ে গেলে মাঝে মাঝে ভিজায়ে নিতে হবে।

১০। পেট্রিডিসেও বীজ ১০০টি সাজায়ে ডিসের ঢাকনা দেওয়ার আগে পিপেটের সাহায্যে পানি দিয়ে বীজগুলো ভিজিয়ে নিয়ে জানালার কাছে টেবিলে রেখে দিতে হবে।

অংকুরিত বীজ গণনা

চারার শ্রেণিভেদ	কতবার/ রেপ্লিকেশন (কমপক্ষে ৩ বার)	অংকুরিত বীজের সংখ্যা ও দিন										গড় %
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
স্বাভাবিক চারা	১ম বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												
স্বাভাবিক চারা	২য় বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												
স্বাভাবিক চারা	৩য় বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												

ক) সাধারণত বীজ বসানোর ৩য় দিন হতে অংকুর গণনার কাজ শুরু এবং ৭ম দিনে শেষ করতে হয়। প্রতিদিন অংকুরিত বীজ গণনার পর পাত্র হতে সেগুলো ফেলে দিতে হয় এবং তা ছকে লিখে রাখতে হয়।

খ) যে বীজের মূল ও কান্ড স্পষ্টভাবে গজাতে দেখা যায় সে বীজকেই গজানো বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে কমপক্ষে ৩টি পাত্রের (একই জাতীয়) অংকুরিত বীজের হিসাব নিয়ে গড় করে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ মাটির পাত্রে বসানো বীজের অংকুর হার নির্ণয়-

২০২৫

মাটির পাত্র	প্রতি পাত্রে বীজের সংখ্যা	গজানো বীজের সংখ্যা	বীজ গজানোর শতকরা হার (%)	গড় হার (%)
১ম পাত্র	১০০টি	৮২	৮২	৮২.৫
২য় পাত্র	১০০টি	৮০	৮০	
৩য় পাত্র	১০০টি	৭৮	৭৮	
৪র্থ পাত্র	১০০টি	৯০	৯০	
মোট ৪টি পাত্র	মোট=৪০০টি	মোট=৩০০টি	৩৩০/৫৪=৮২.৫%	

কাজের সতর্কতা

১। সূত্রের মান বসানোর সময় নির্ভুলভাবে বসাতে হবে।

২। ক্যালকুলেটর বা গণনা যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে তথ্য দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সবজির বীজের অংকুরোদগম হার নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩.২: সবজি ফসলে মাদা ও বেড তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- সবজি চাষ করার জন্য মাদা ও বেড তৈরিতে কি কি উপকরণ লাগে তা জানতে পারবে।
- আধুনিক উপায়ে মাদা ও বেড প্রস্তুত করতে পারবে
- মাদা ও বেডে ব্যবহৃত সারের নাম ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- পানি সেচ ও নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;

৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পুর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন

৪. পোশাক পরিধান করা;

৫. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৬. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

যে সকল সবজির শিকড়, কান্ড, শাখা-প্রশাখা বেশি বিস্তৃত হয় সেসব সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হয়। এসব মাদা পার্শ্ববর্তী নালা থেকে উঁচুতে হয়, যা অতিবৃষ্টি থেকে মাদা তথা সবজি ফসলকে বাঁচায়। সবজি ফসলের জন্য সুনির্দিষ্ট মাপের বেড তৈরি করতে হয়। বীজতলায় বড় হওয়া চারা বেডে স্থানান্তর করা হয়। আবার কিছু কিছু সবজি বেডে সরাসরি লাগানো হয়। রোপণকৃত চারার আন্ত: পরিচর্যার জন্য ছোট ছোট বেডে প্রতিস্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ম্যাজারিং টেপ, ২। কোদাল, ৩। টুকরি, ৪। আঁচড়া, ৫। রশি, খুঁটি, ৭। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৮। চুন, ৯। বাঁশের কঞ্চি বা লাঠি, ১০। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

ক) মাদা তৈরি

১। মাদা তৈরির জন্য জমিতে কোদাল দিয়ে ৬০ সে.মি. ব্যাস এবং ৬০ সে.মি. গভীর করে গর্ত তৈরি করতে হবে।

২। গর্তের উপরের অর্ধেক ও নিচের অর্ধেক মাটি আলাদা করে তুলে রাখতে হবে এবং ২-৩ দিন গর্ত ও মাটিতে সূর্যকিরণ লাগতে দিতে হবে।

৩। গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে অনুমোদিত জৈব সার ও টিএসপির সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং এমওপির অর্ধেক পরিমাণ মিশিয়ে নিতে হবে।

৪। এ মিশ্রিত মাটি ও সার গর্তে ফেলতে হবে।

৫। এরপর গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্তের বাকী অংশ ভর্তি করতে হবে।

৬। মাদার মুখ জমির লেভেলের তুলনায় ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে দিতে হবে এবং কমপক্ষে ৭ দিন এভাবে রাখতে হবে। এরপর বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে।

খ) বেড তৈরি

১। প্রথমে একটি কোদাল নিয়ে ১৫ সে.মি. গভীর করে ভালোভাবে কুপিয়ে নিতে হবে।

২। আঁচড়া ও কোদাল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, আগাছামুক্ত, সমতল করে নিতে হবে।

৩। এরপর এতে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১ মিটার প্রস্থ আকারের বেড মেপে নিতে হবে।

৪। বেডের জন্য মাপা জমির চারিদিকে ২৫ সে.মি. চওড়া এবং ১৫ সে.মি. গভীর পানি নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে। নালার মাটি বীজতলার জমির উপর কোদাল দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৫। নালার তলা থেকে বেডের উচ্চতা ১৫ থেকে ২০ সে.মি. করে নিতে হবে।

৬। প্রতিটি বেডে ২০ কেজি জৈব সার ও ১০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৭। উপরের মাটি সমতল ও মিহি করে নিতে হবে।

৮। বীজ বপন ও চারা রোপণের জন্য এবার বেড প্রস্তুত হলো।

৯। সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৭ দিন পর বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে পারবে।

কাজের সতর্কতা

১। মাদা ও বেডে কাঁচা জৈব সার প্রয়োগ করা যাবে না।

২। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে বীজতলায় সমানভাবে পড়ে।

৩। মাদা ও বেডের মাটির সাথে অনুমোদিত জৈব ও রায়নিক সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

সবজি ফসলে মাদা ও বেড করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সোলানেসী গোত্রের সবজি চাষ
(Cultivation of Solanaceous Vegetables)



আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শাকসবজির গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায় যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে আলু, বেগুন, টমেটো, মরিচ ইত্যাদি খেয়ে থাকি। তবে এগুলো কি ধরণের সবজি এটা অনেকেই জানিনা? এগুলো সোলানেসী গোত্রের বা বেগুন পরিবারের সবজি। বেগুন পরিবারে সবজির সংখ্যা খুব কম, কিন্তু উৎপাদনের পরিমান ও অর্থনৈতিক গুরত্বের কথা বিবেচনায় করলে এই পরিবারের আলু,বেগুন ও টমেটো বিশ্বের তিনটি শীর্ষস্থানীয় সবজি। পরিকল্পিতভাবে সোলানেসী গোত্রের সবজি উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব । এই অধ্যায়ে আমরা এ সকল সবজি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন সোলানেসী গোত্রের সবজির জাত নির্বাচন করতে পারবে
- জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ করতে পারবে
- চারা রোপন করতে পারবে
- অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- সেচ ও নিষ্কাশন করতে পারবে
- সবজি ফসল সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে

৪.১ বেগুন (Eggplant/Brinjal)




বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি । এটি একটি সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও চেনা সবজি যা প্রায় প্রত্যেকের রান্নাঘরেই মজুদ থাকে। বছরব্যাপি বেগুন চাষের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু খুবই উপযুক্ত। বেগুন চাষ করে অনেক কৃষকই স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

৪.৩.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: বাংলাদেশ, ভারত ও তৎসংলগ্ন এলাকা বেগুনের উৎপত্তিস্থল।

ইংরেজি নাম: **Brinjal/Egg Plant**,

বৈজ্ঞানিক নাম: *Solanum melongena*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: পুষ্টিমূল্যের দিক দিয়ে বেগুন একটি উৎকৃষ্ট মানের সবজি। ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১.১ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ৪ গ্রাম, স্নেহ ০.১ গ্রাম, ভিটামিন এ ৭০ (আই. ইউ.), থায়ামিন ০.০১ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০২ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৭ মিলিগ্রাম রয়েছে।

ব্যবহার: বাংলাদেশে বেগুনের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রধানত তরকারী, ভাজি, ভর্তা ও বেগুনী হিসাবে ভক্ষণ করা হয়। বিশেষত বাংলাদেশে বিকালের নাস্তায় বেগুনী একটি জনপ্রিয় খাবার।

জলবায়ু ও মাটি: বেগুন উষ্ণ জলবায়ুর ফসল। বেগুনের ফল ধারণের উপযুক্ত তাপমাত্রা সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ ডিগ্রি সে। তাপমাত্রা এর কম বেশি হলে বেগুনের ফুল ও ফল ধারণ ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের জন্য শীতকালীন জলবায়ু বেগুন চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে প্রায় সব মাটিতেই বেগুন জন্মে থাকে। ভাল ফলন পেতে এঁটেল দো-আঁশ, দো-আঁশ ও পলিমাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।

উৎপাদন মৌসুম: বাংলাদেশের জলবায়ুতে বছরের যে কোন সময়ই বেগুনের চাষ করা যেতে পারে। তবে রবি মৌসুমে বেগুন চাষ করলে ফলন খরিপ মৌসুমের চেয়ে ভালো পাওয়া যায়। রবি মৌসুম অর্থাৎ শীতকালের জন্য সাধারণত আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুম অর্থাৎ বর্ষাকালীন বেগুনের জন্য জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। রবি মৌসুমে চাষের জন্য যে কোন জাতের বেগুন লাগানো যেতে পারে, কিন্তু খরিপ মৌসুমে চাষের জন্য বারমাসী জাতসমূহ লাগাতে হবে।

জাত পরিচিতি: দেশের বিভিন্ন জেলাগুলোতে স্থানীয় ফসল হিসেবে বিভিন্ন জাতের বেগুন চাষ করা হয়। মৌসুম ভিত্তিতে সব জাত গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেমন- শীতকালীন জাত ও বারমাসী জাত। শীতকালীন জাতের বেগুন কেবল মাত্র রবি মৌসুমেই চাষ করা হয়ে থাকে। আর বারমাসী জাতের বেগুন সারা বছরই চাষ করা যায়।

২০২৫

ক) স্থানীয় জাত: আমাদের দেশের স্থানীয় উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হলো ইসলামপুরী, উত্তরা, লাফফা, নয়নকাজল, ঈশ্বরদি- ১, খটখটিয়া, সাহেব বেগুন, তাল বা তল্লা বেগুন, কেজি বেগুন, শীংনাথ ইত্যাদি।

খ) হাইব্রিড জাত: বিটি বেগুন, কাজলা (বারি বেগুন ৪), নয়নতারা (বারি বেগুন ৫), তারাপুরী (বারি বেগুন ২), ডিম বেগুন, মুক্তকেশী ইত্যাদি জাত সমুহ।



ইসলামপুরী



খটখটিয়া



ঈশ্বরদি - ১



লাফফা



উত্তরা (বারি বেগুন ১)



বারি বিটি বেগুন-১

চিত্র : **বেগুনের বিভিন্ন জাত**

৪.৩.২ উৎপাদন পদ্ধতি/ চাষাবাদ পদ্ধতি

৪.৩.২.১ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ বপনের সময়: রবি মৌসুম অর্থাৎ শীতকালের জন্য সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুম অর্থাৎ বর্ষাকালীন বেগুনের জন্য জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজ সংগ্রহ: বিশ্বস্ত কোনো উৎস (সরকারি/ বেসরকারি) থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ বাছাই: বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে বেগুনের উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। তাই অপুষ্ট ও অন্য শস্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করা জরুরি।

বীজশোধন: বীজতলায় বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান) ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে বীজ শোধন করা।

২০২৫

বীজহার: অংকুরোদগমের হার ৮০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টর জমিতে বেগুন চাষের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

চারা উৎপাদন: বেগুন চাষের জন্য প্রথমে বীজতলায় চারা করে তা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। বীজতলা এমন স্থানে তৈরী করতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়াবে না অর্থাৎ সুনিষ্কাশিত হতে হবে, সর্বদা আলো-বাতাস পায় অর্থাৎ ছায়ামুক্ত হতে হবে। দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির আকারভেদে দৈর্ঘে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। বীজতলায় সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য ৫ সেমি দূরত্বে ক্ষুদ্র নালা/সারি তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাশাপাশি দুটো বীজতলার মধ্যে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত। এ ফাঁকা জায়গা থেকে মাটি নিয়ে বীজতলা উঁচু করে নিতে হবে। অল্প সংখ্যক চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা হিসেবে কাঠের বাক্স, প্লাস্টিকের ট্রে অথবা বড় টব ব্যবহার করা যেতে পারে। চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা যেমন- চাটাই/নেট দ্বারা ঢেকে অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে সকালে ও সন্ধ্যায় হালকাভাবে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা গজানোর পর ২-৩ দিন অন্তর হালকা সেচ দেওয়া উচিত।



চিত্র : বীজতলার পরিচর্যা

৪.৩.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: যে জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না ও সবসময় আলো-বাতাস পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ: সাধারণতঃ মাঠের জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝরঝরে করে নিতে হবে। বেগুনের শিকড় যেহেতু দীর্ঘ প্রসারী, কর্ষণের গভীরতা যত বেশী গাছের জন্য তত মঙ্গলজনক।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: বেগুন চাষে সার প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ১৪৫ থেকে ১৫৫ কেজি টিএসপি, ৩৭০ থেকে ৩৮০ কেজি ইউরিয়া, ২৪০ থেকে ২৬০ কেজি এমপি এবং গোবর ৮ থেকে ১২ টন হারে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর প্রয়োগ করতে হয় আর বাকি অর্ধেক গোবর সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও এমপি সার পিট বা মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি সার চারা লাগানোর ১০-২৫ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং তৃতীয় কিস্তি ফল

তোলার মাঝামাঝি সময়ে দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েকদিন পর মাটিতে চটা ধরে। মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হয় যাতে করে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ: বীজতলায় চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে চারা রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় চারাতে ৫-৬টি পাতা গজায় এবং চারা প্রায় ১৫ সেমি. লম্বা হয়। বেগুনের চারার বয়স একটু বেশী হলেও লাগানো যেতে পারে। প্রয়োজনে দু'মাস পর্যন্ত চারা বীজতলার রেখে দেওয়া যায়। চারা তোলার সময় যাতে শিকড় নষ্ট না হয় সেজন্য চারা তোলার ১-২ ঘন্টা আগে বীজতলায় পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারার রোপণ দূরত্ব জাত, মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন মৌসুমের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ বড় আকারের বেগুনের জাতের ক্ষেত্রে ৯০ সেমি. দূরে সারি করে সারিতে ৬০ সেমি. ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে এবং ক্ষুদ্রাকার জাতের ক্ষেত্রে ৭৫ সেমি. সারি করে সারিতে ৫০সেমি. ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে। জমিতে লাগানোর পর পরই যাতে চারা শুকিয়ে না যায় সে জন্য সম্ভব হলে বিকালের দিকে চারা লাগানো উচিত।

বেগুনের চারা রোপণের সময়: সাধারণত বেগুনের চারা মাঘ-ফাল্গুন মাসে গ্রীষ্মকালীন, বৈশাখ মাসে বর্ষাকালীন, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে শীতকালীন ফসলের জন্য রোপণ করা হয়ে থাকে।

৪.৩.২.৩ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

১) শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): কোন গাছ মরে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে ৮-১০ দিনের মধ্যে সেখানে নতুন করে চারা রোপণ করতে হবে।

২) আগাছা দমন: কোন ভাবেই জমিতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবেনা। আগাছা দেখা দিলে সাথে সাথে নিড়ানী দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

৩) আইল তুলে দেওয়া: চারা রোপনের মাসখানেক পর দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান হতে মাটি উঠিয়ে সারি বরাবর অনুচ্চ আইল তুলে দেওয়া একটি উত্তম ব্যবস্থা। শীতকালীন ফসলের বেলায় এইভাবে সৃষ্ট নালা পানি সেচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, বর্ষাকালীন ফসলের পানি নিষ্কাশনের জন্য এটি প্রয়োজন।



চিত্র : আইল বা মাটি তুলে দেওয়া

২০২৫

৪) সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: বেগুন গাছের প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। বেলে মাটিতে ১০ থেকে ১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া জমিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। বর্ষাকালে বেগুনের জমিতে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেগুন গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না।



চিত্র : সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা

৫) খুঁটি দেওয়া ও ছাঁটাই করা: গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। লম্বা জাতের গাছে খুঁটি দিতে হবে যাতে বেগুন গাছ হেলে না পড়ে। সাধারণত বেগুনে ডাল ছাটাই করা হয়না তবে বারোমাসী বেগুনের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ফল দেওয়ার পর গাছের পুরাতন ডালপালা ছেটে দিলে নতুন সতেজ কুঁড়ি বের হয় ও তাতে উৎকৃষ্ট ফল ধরে।



চিত্র : খুঁটি প্রদান

৬) মাটি আলগা করে দেওয়া: গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে আলগা করে দিতে হবে।

৭) সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

৮) বেগুনের রেটুন/ মুড়ি ফসল: মুড়ি ফসলকে ইংরেজিতে বলে 'রেটুন ক্রপ'। মূল ফসল কাটার পর অবশিষ্টাংশ গোড়া থেকে পুনরায় গাছ হয় ও ফলন পাওয়া যায়। একেই মুড়ি ফসল বলে। মুড়ি ফসলে চাষ, লাগানো ও অন্যান্য যত্ন কম নিতে হয়। তাই ফলন কম হলেও চাষের খরচ কম হয় বিধায় কৃষকের লাভ হয়। তবে কিছু যত্ন যেমন আগাছা ও মরা পাতা পরিষ্কার করে দেয়া, ছত্রাকনাশক স্প্রে করা এ সকল পরিচর্যা

করলে ফলন বাড়ে। পুরাতন বেগুনের গাছ থেকে কম সময়ে নতুন গাছের মত ফলন পাওয়ার জন্য অনেকেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। শীতকালীন জাতকে রেটুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৯) ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড়: বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম।

ক) বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: ডগা ও ফল ছিদ্র করে কুড়ে খায়। আক্রান্ত ডগা ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায়। ফলে আক্রমন হলে তা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে।



চিত্র :বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির লক্ষণ

দমন ব্যবস্থাপনা

- অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করতে হবে।
- কীটনাশকের বদলে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে নিয়ে এর নির্যাস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার/ ৪ মুখ অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার /২ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।



চিত্র : আলোর ফাঁদ



চিত্র : সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

খ) বেগুনের কাটুই পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: কীড়া অবস্থায় এই পোকা দিনের বেলা মাটির ফাটলে বা গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলা বের হয়ে চারা গাছের গোড়ায় মাটি বরাবর কেটে দেয়। বেঁচে থাকার জন্য যা খায় তার চেয়ে বেশি কেটে নষ্ট করে। তীব্র আক্রমণে ক্ষেত প্রায় চারা শূন্য হয়ে পড়ে।



চিত্র : বেগুনের কাটুই পোকার ক্ষতির লক্ষণ

দমন ব্যবস্থা

- সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশে পাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ দেখা গেলে সেচ দিতে হবে, এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।

গ) বেগুনের কাঁটালে পোকা

ক্ষতির ধরণ: দলবদ্ধভাবে আক্রমন করে। আক্রান্ত পাতার সবুজ আংশ খেয়ে জালিকার মত ঝাঁঝরা করে ফেলে। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রমন বেশি হলে গাছ মারা যায়।



চিত্র : পুর্নাঙ্গ কাঁটালে পোকা



চিত্র : ক্ষতির নমুনা

দমন ব্যবস্থা

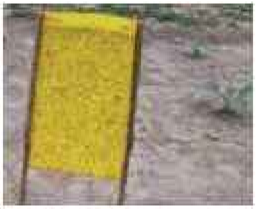
- শতকরা ১০ ভাগ পাতা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ২০ গ্রাম) ৫ শতক জমির জন্য ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানিতে সুমথিয়ন ২মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করা।

ঘ) বেগুনের জাব পোকা

ক্ষতির ধরণ: পূর্ণাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা গাছের পাতা, কচি কাণ্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়ে যায়, পাতা কুচকে যায়। ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমন হলে ফুলের কুঁড়ি ঝরে পড়ে । আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মারা যায়।



চিত্র :জাব পোকায় আক্রান্ত পাতা



চিত্র : হলুদ ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

- গাছের আক্রান্ত অংশ অপসারণ করা। প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা ।
- পরিস্কার পানি জোরে স্প্রে করা।
- ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা ।
- হলুদ রঙের ফাঁদ ব্যবহার করা। হলুদ ফাঁদ মূলত বিভিন্ন পোকার উপস্থিতি (বিশেষত জাব পোকাসহ অন্যান্য ছোট পোকা) ও পরিমাণ বোঝার জন্য এবং দমনে ব্যবহার করা হয়। ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পোকা সেখানে উড়ে এসে পড়ে এবং আঠাতে আটকে যায়। পরে পানিতে কাপড় ধুয়ে নিলে সব পোকা মারা যায়। কাপড়টিতে পুনরায় আঠা/ভাতের মাড় লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়।
- তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা ।
- আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বেগুনের রোগ ও দমন পদ্ধতি

ক) ঢলে পড়া বা গোড়া ও মূল পচা (Damping off or foot and root rot) রোগ: বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: এই রোগটি নার্সারীতে হয়ে থাকে। এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ অংকুরোদগমের সময় আক্রমণ শুরু করে। পরে চারার শিকড়, কান্ডের গোড়া ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রধান মূলে আক্রমণ করে। আক্রান্ত চারার কান্ডের গোড়ার অংশে ফ্যাকাশে সবুজ ও বাদামী দাগ দেখা যায়। দাগটি কান্ডের উপরের দিকে ও নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চারার গোড়ার আক্রান্ত অংশের কোষ সমূহ পচে যায়। চারা ঢলে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার

- সুনিস্কাশিত উঁচু বীজতলা তৈরী করতে হবে।
- বীজ বপনের ২ সপ্তাহ পূর্বে বীজতলা শোধন করতে হবে।

- ➢ বীজতলার পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ➢ কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম (প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

খ) ফোমোপসিস ব্লাইট/ফল ও কান্ড পচা (Phomopsis blight/Fruit and stem rot)

রোগ: এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: বীজ, চারা, কান্ড, ডাল, পাতা, ফুল ও ফল এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণত: নীচের পাতায় প্রথম দাগ দেখা যায়, পরে দাগগুলি স্পষ্ট গোলাকার ও ধূসর বাদামী রং ধারন করে। বেশী আক্রান্ত পাতা হলুদ হয়ে মারা যায়



চিত্র : ফোমোপসিস ব্লাইট/ ফল ও কান্ড পচা রোগ

ও ঝরে পড়ে। ফল গাছে থাকতেই আক্রান্ত হয়। ফলের উপর ফ্যাকাশে কিছুটা বসানো দাগ পড়ে, আক্রান্ত স্থলে বাদামী ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায়।

প্রতিকার

- ➢ সুস্থ ও নীরোগ বেগুন হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ➢ কালো ও কুচকানো বীজ ব্যবহার করা যাবে না।
- ➢ কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম (প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।
- ➢ বেগুন পরিবারের সবজি বাদ দিয়ে শস্য পর্যায় (অন্য সবজি চাষ) অবলম্বন করতে হবে।
- ➢ এই ছত্রাক আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশসমূহে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে, তাই আক্রান্ত গাছ, ঝড়ে পরা পাতা, ডালপালা একত্র করে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ➢ কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার জমির সব গুলো গাছে স্প্রে করতে হবে।

গ) ব্যাকটেরিয়া ঢলে পড়া (Bacterial wilt) রোগ: ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: গাছের যে কোন বয়সে রোগটি দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ডাটা খুব দ্রুত ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছ বিকালের দিকে ঢলে পড়ে আবার সকালের দিকে সতেজ হয়। এভাবে ৩-৪ দিন পর সকালেও সতেজ হয় না এবং গাছ সবুজ অবস্থাতেই ঢলে পড়ে ও মরে যায়।

প্রতিকার

- ➢ সুস্থ চারা সংগ্রহ করতে হবে ।
- ➢ রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন- বারি বেগুন ৬, বারি বেগুন ৭, বারি বেগুন ৮ চাষ করতে হবে।
- ➢ বুনো বেগুন গাছের কান্ডের সাথে কাংখিত জাতের বেগুনের জোড়কলম করতে হবে।

২০২৫

- ➢ শস্য পর্যায়ে বাদাম, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করতে হবে।
- ➢ ঢলে পড়া চারা বা গাছ দেখা মাত্র মাটি সহ তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- ➢ কিউপ্রোক্স্যাট ৩৪৫ এসসি ১ লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার জমিতে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।
- ➢ ব্যাকটেরিয়া নাশক স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট + টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড (ক্রোসিন-এজি ১০ এসপি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৮ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার জমিতে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

ঘ) বেগুনের ছোট পাতা বা ক্ষুদে পাতা রোগ (Little Leaf of Brinjal): এটি মাইকোপ্লাজামা জনিত রোগ ।

রোগের লক্ষণ: আক্রান্ত গাছে ছোট ছোট অনেক পাতা হয় এবং পাতাগুলো গুচ্ছ দেখা যায়। জ্যাসিড পোকা এ রোগ ছড়ায়। বেগুন চাষের সময় তাপমাত্রা বাড়লে জ্যাসিড পোকার আক্রমণ বেশী হয়। গাছের বয়স এক মাস হওয়ার পর এ রোগ দেখা যায়। তবে পূর্ণ বয়স্ক গাছে এ রোগের তীব্রতা বেশী হয়।



চিত্র :বেগুনের ছোট পাতা বা ক্ষুদে পাতা রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

- ➢ বেগুন পরিবারভুক্ত ফসলের চাষ কমানো।
- ➢ আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলা।
- ➢ আক্রান্ত গাছের গোড়ায় গাছ প্রতি ২৫৮ গ্রাম চুন মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে গাছ ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠে।
- ➢ গাছের বয়স এক দেড় মাস হলে বাহক পোকা (জ্যাসিড) দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে সুমিথিয়ন ১.৫ গ্রাম, এডমায়ার ১.২ মিলি ও এমিটাফ- ২৫ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে। ফল যখন পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় অথচ বীজ শক্ত হয় না তখন ফল সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। এ সময় ফলের ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে থাকব। অনেকে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দুই আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে যদি বসে যায় এবং চাপ তুলে নিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে বেগুন কচি রয়েছে আর চাপ দিলে যদি নরম অনুভুত হয়, অথচ বসবে না এবং আঙ্গুলের ছাপ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। সাধারণতঃ চারা রোপণের ৩০ দিনের বেশি সময় পর ফুল আসে এবং এর প্রায় ৩০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফুল ফোটার পর ফল পেতে গড়ে প্রায় ১ মাস সময় লাগে। জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ১৭-৬৪ টন ফলন পাওয়া যায়।

খাওয়ার উপযোগী বেগুন ক্ষেত থেকে তোলার সময় সাবধানে সংগ্রহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের গায়ে যেন আঘাত না লাগে বা ক্ষত সৃষ্টি না হয়। গাছ থেকে তোলা বেগুন কাঁচা পাতা অথবা খড়ের উপর রাখতে হবে যেন বেগুনে আঘাত না লাগে; এটা অতি প্রয়োজনীয়।

৪.২ টমেটো



টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ বেগুন পরিবারের একটি প্রধান শীতকালীন সবজি। টমেটো পুষ্টি গুণে ভরা এক ধরনের সালাদ সবজি। বাংলাদেশে যেসব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে টমেটো অন্যতম। সারা বিশ্বে আলুর পরই টমেটো উৎপন্ন হয়।

৪.২.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : মধ্য অথবা দক্ষিণ আমেরিকা টমেটোর উৎপত্তি স্থান।

ইংরেজি নাম: Tomato

বৈজ্ঞানিক নাম: *Lycopersicum esculentum*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী অংশে যে পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা হল - পানি ৯৩.১ গ্রাম, প্রোটিন ১.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, খনিজ ০.৬ গ্রাম, আঁশ ০.৭ গ্রাম, শর্করা ৩.৬ গ্রাম, সোডিয়াম ৪৫.৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১১৪ মিলিগ্রাম, কপার ০.১৯ মিলিগ্রাম, সালফার ২৪ মিলিগ্রাম, ক্লোরিন ৩৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৩২০ আর্ন্তজাতিক একক, থায়ামিন ০.০৭ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাবিন ০.০১ মিলিগ্রাম, নিকোটিনিক এসিড ০.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ৩১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১৫ মিলিগ্রাম, অক্সালিক এসিড ২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৩৬ মিলিগ্রাম এবং লৌহ আছে ১.৮ মিলিগ্রাম।

ব্যবহার: টমেটো কাঁচা, পাকা এবং রান্না করে খাওয়া হয়। টমেটোর পুষ্টির পাশাপাশি ভেষজ মূল্যও আছে। এর শাঁস ও জুস হজমকারক এবং ক্ষুধাবর্ধক। টমেটো রক্ত শোধক হিসেবেও কাজ করে। আমাদের দেশে ইহা প্রধানত: সালাদ, ব্যঞ্জনের উপকরণ এবং ঝোল বা টক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি মৌসুমে বিপুল পরিমাণ টমেটো সস, কেচাপ, চাটনি, জুস ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। রাতের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রী সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগী সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। মাটির পিএইচ (pH) ৬ - ৭ হলে ভাল হয়। মাটির অম্লতা বেশি অর্থাৎ pH কম (৬ এর নীচে) হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

টমেটোর জাত: মৌসুম অনুযায়ী এ দেশে চাষযোগ্য টমেটো জাতসমূহকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করা যেতে পারে:

ক) আগাম জাত: এসব জাত শীতকালেই হয়, তবে আগাম ফলে। আগাম জাতসমূহের বীজ বপন করা হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। আগাম জাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বারি টমেটো ৪, বারি টমেটো ৫, রোমা ভিএফ, টিপু সুলতান, গ্রেট পেলে, ভেল্টা এফ ১, পুষারুবী ইত্যাদি।

খ) ভরা মৌসুমী জাত: শীতকালে স্বাভাবিক সময়েই এসব জাতের গাছে ফল ধরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ বুনে অক্টোবর-নভেম্বরে এসব জাতের টমেটোর চারা রোপণ করা হয়। এসব জাতের মধ্য থেকে মানিক, রতন, বারি টমেটো ৩, বারি টমেটো ৬, বারি টমেটো ৭, বারি টমেটো ৯, বাহার ইত্যাদি জাতকে বেছে নেয়া যেতে পারে।

গ) নাবী শীত মৌসুমী জাত: এসব জাতের বীজ বুনতে হয় জানুয়ারিতে, ফল পাওয়া যায় মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। বাহার, রোমা ভিএফ, রাজা, সুরক্ষা ইত্যাদি জাত নাবি চাষের জন্য ভাল।

৪.২.২ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ ও বীজতলার মাটি শোধন

টমেটো চাষ করা হয় চারা তৈরি করে। এজন্য বীজতলায় বীজ বুনে সেখানে চারা তৈরি করে নিতে হয়। টমেটো চাষে সফলতার জন্য কেনা বীজ বা ঘরে রাখা বীজ প্রথমে শোধন করে নিতে হবে। সম্ভব হলে বীজতলায় বোনার আগে অংকুরোদগম পরীক্ষাও করে নেয়া উচিত। বীজের মধ্যে অনেকসময় রোগজীবাণু লুকিয়ে থাকে। যেমন আগাম ধ্বসা বা আর্লি ব্লাইট রোগ, মোজাইক ভাইরাস, ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া ইত্যাদি রোগের জীবাণু বীজে থাকতে পারে। মাটিতে ফেলার পর পানি পেয়ে সেসব রোগজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে চারা মারা যায়। আবার অনেক সময় বীজতলার মাটিতেও কিছু রোগজীবাণু থাকতে পারে। যেমন চারা ধ্বসা বা ড্যাম্পিং অফ রোগের জীবাপু। এসব রোগজীবাণু চারাকে আক্রমণ করতে পারে। সেজন্য বীজতলার মাটিও শোধন করে নিলে ভাল হয়।

বীজ শোধন: বীজ শোধন করা যেতে পারে কয়েক পদ্ধতিতে। গরম পানিতে ভিজিয়ে বীজ শোধন করা সহজ। ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩০ মিনিট টমেটোর বীজ ভিজিয়ে রাখলে বীজের গায়ে লেগে থাকা বা ভেতরে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মরে যায়। এরপর ভিজে যাওয়া বীজ তুলে ছায়ায় শুকিয়ে বপন করতে হবে। কিছু গাছগাছড়ার রস যেমন রসুনের রস দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। এছাড়া ছত্রাকনাশক দিয়েও বীজশোধন করা যায়।

মাটি শোধন: বীজ তলার মাটি চাষ দিয়ে তাতে জৈব সার মিশিয়ে পলিথিন দিয়ে দু'সপ্তাহ ভাল করে ঢেকে রেখে দিলে সূর্যের তাপে মাটিতে থাকা অনেক জীবাণু মরে যায় ও বীজতলার মাটি শোধন হয়ে যায়। সময়

না থাকলে বীজতলার মাটির উপরে ৩ ইঞ্চি পুরু করে কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে আগুন দিলে সে তাপেও রোগ জীবাণু নষ্ট হয়।

বীজতলা তৈরি: চারা তৈরির দুই মাস আগে বীজ বপনের জন্য বীজতলা তৈরির প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য রোদযুক্ত উঁচু জায়গায় পরিস্কার করে ভালভাবে মাটি চাষ দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চাষের পর মাটি সমতল করে ১ মিটার চওড়া করে বেড বানাতে হবে। বেড খুব বেশি লম্বা না করে ৩-৫ মিটার করা ভাল। এতে পরিচর্যার সুবিধে হয়। বীজ বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এ রকম ২০-২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

বীজ বপনের সময়: শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল-জুন (বৈশাখ-আষাঢ়)।

বীজের হার: বীজতলায় বীজ বপনের ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি ১ গ্রাম (২০০ গ্রাম/হেক্টর) বীজ লাগে। তবে জাত ভেদে বীজের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।

চারা উৎপাদন: সরাসরি জমিতে বীজ বুনে ও টমেটো চাষ করা যায়। তবে দ্রুত ভাল ফলন পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে চারা তৈরি করে সেই চারা মূল জমিতে লাগাতে হবে। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য পরিপক্ক ও রোগমুক্ত বীজ ঘন করে ৩ মি. x ১মি. আকারের বীজতলায় বুনতে হবে। বীজ থেকে চারা গজাতে ৬-১৪ দিন লাগে। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ x ৪ সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে।

৪.২.৩ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

সারের পরিমান: টমেটো উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হবে

সারের নাম	সারের পরিমান/ হেক্টর
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ কেজি
এমওপি	২০০-৩০০ কেজি
গোবর	৮-১২ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক গোবর সার ও সবটুকু টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশী ছাঁটাইয়ের পর চারা লাগানোর ৩য় সপ্তাহে ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ায় প্রয়োগ

করতে হয়। ঘাটতি থাকলে জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড পাউডার এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সারও প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপন: চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারির উপরে চারা থেকে চারা ৪০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম এবং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

রোপণ সময়: শীতকালীন টমেটোর জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মাঘের ১ম সপ্তাহ (নভেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। তবে আগাম চাষের জন্য রোপণ সময় এগিয়ে আনতে হবে। আগাম চাষের জন্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এবং নাবি চাষের জন্য ফাল্গুণ মাসে এবং গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য জন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে চারা রোপণ করতে হবে।

পলিথিন ছাউনি: ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেডে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে। একটি ছাউনি ২০X২.৩ মিটার আকারের হয়। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালাসহ) দুটি বেডে লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ছাউনির উচ্চতা হবে দুপাশে ৪.৫ ফুট বা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানে ৬ ফুট বা ১৮০ সেমি। দুটি ছাউনির মাঝে অন্তত ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে করে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। পলিথিন ছাউনি লম্বায় জমির আকার আকৃতির ওপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে কিন্তু চওড়া (বাজারে প্রাপ্ত পলিথিনের সর্বোচ্চ চওড়া অনুযায়ী) ২.৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাউনি ২০ মিটার লম্বা হলে প্রতি হেক্টরে এ ধরনের প্রায় ১৭০টি ছাউনি প্রয়োজন হতে পারে।



চিত্র : পলিথিন ছাউনি

৪.২.৪ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন

একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্চণীয়।

নিড়ানী দেয়া: প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

আগাছা দমন: টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: সময়মতো বর্ণিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ছাটাই বা প্রুনিং: এটি এক ধরণের বিশেষ পরিচর্যা। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে এতে ফলের গুণগতমান বাড়ে। মরা পাতা ছাঁটাইসহ 'এ' আকৃতি বাঁশের খুটি দিয়ে ঠেকনা দেওয়া টমেটো গাছের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ।



চিত্র : খুটি দিয়ে দেওয়া টমেটো গাছ (A আকৃতির)

রোগ-বালাই ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা: টমেটো উৎপাদনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো রোগবালাই। টমেটো রোগগুলো নিয়ন্তণে রাখতে পারলে ফলন অনেক বৃদ্ধি পাবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

(১) গোড়া ও মূল পচা রোগ (Damping off and root rot): বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: বীজে আক্রমণ হলে বীজ পচে যায়। বীজ অংকুরোদগমের পরেই প্রাথমিক পর্যায়ে চারা মারা যায় একে প্রিইমারজেন্স ড্যাম্পিং অফ বলে। পোস্ট-ইমারজেন্স ড্যাম্পিং অফের বেলায় চারার হাইপোকোটাইলের কর্টিক্যাল কোষ দ্রুত কুঁচকে যায় ও কালো হয়ে যায়। চারার কান্ড মাটির কাছাকাছি পচে চিকন হয়ে যায়। কান্ডের গায়ে ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়।

প্রতিকার

- বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে; বীজ ৫০°সে তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৩০ মিনিট রেখে শোধন করে নিয়ে বপন করতে হবে
- রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ব্যভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা কিউপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে চারার গোড়ায় দিতে হবে।

ছত্রাকনাশক স্প্রে



চিত্র : গোড়া পচা রোগ

(২) গাছ বা পাতা কুঁকড়ানো (Leaf curl): এটি ভাইরাস জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: পাতার কিনার থেকে শিরার দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। পাতা খসখসে হয় এবং হলুদ হয়ে যায়, এতে করে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাতা কুঁকড়ানো রোগের তিনটা কারনে হয়ে থাকে। যদি গাছে মাকর ও থ্রিপস্ পোকা থাকে তাহলে গাছ কুঁকড়ে যায় মটিতে এবং জিংক এর ঘাটতি থাকে তখন এটা বেশি দেখা যায়।



চিত্র : গাছ বা পাতা কুঁকড়ানো

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধ জাতের চারা লাগাতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

- গাছ রোপনের ১৫ দিন পর থেকেই আট দিন পর পর ভার্টিমেক ও কনফিডর মিক্সার করে স্প্রে করতে হবে।চারা লাগানোর এক মাস পর থেকে ১৫ দিন পর পর একবার মিমজিংক গোল্ড স্প্রে করতে হবে।

(৩) ঢলে পড়া (Bacterial wilt): এটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: এ রোগের আক্রমনে প্রথমে গাছের উপরের দিকের কিছু পাতা নেতিয়ে পড়ে, দু একদিনের মধ্যে পুরো গাছ ঢলে পড়ে ও মারা যায়। এ রোগে গাছের শিকড়, মূল, কান্ড বা অন্য কোথাও পচন দেখা দেয় না। সাধারনত গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় যখন ফুল ফল আসতে শুরু করে তখন রোগের আক্রমন ব্যাপক হয়।



চিত্র : ঢলে পড়া রোগ

প্রতিকার

- জমি চাষের সময় ব্লিচিং পাউডার ১৫-২০ কেজি/হেক্টর মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে মাটিতে বিদ্যমান ব্যাক্টেরিয়া মারা যায়।
- গাছের চারা লাগানোর আগে চারার গোড়ার অংশ কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক বা অনুমোদিত ব্যাক্টেরিয়া নাশকের দ্রবনে ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে লাগাতে হবে।
- জমিতে চারা লাগানোর আগে মাটিতে চারা লাগানোর স্থানে এক চিমটি ৫-১০ গ্রাম/ পিট ফুরাডান ৫ জি মিশিয়ে দিতে হবে। এতে মাটিতে বিদ্যমান কৃমি ও কাটুই পোকা মারা যাবে।
- জমিতে রোগের আক্রমন দেখা দিলে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না, শুধুমাত্র গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- ইউরিয়া সার কম দিতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত স্থানের মাটি সরিয়ে ফেলে, নতুন মাটি দিয়ে নতুন করে গাছ লাগাতে হবে।
- কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকে ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী উপাদান রয়েছে।

(৪) নাবী ধ্বসা (Late blight): এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: এ রোগটি গাছের আক্রান্ত অংশ, বীজ, মাটি ও পানি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমণে হলে টমেটো গাছের পাতায় বিভিন্ন আকারের ভেজা বাদামি বর্ণের দাগ পড়ে। দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি

পেতে থাকে। একটা সময়ে গাছের পাতা পচে যায়। শুষ্ক ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পাতার পচন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমনের কয়েক দিনের মধ্যে গাছ মারা যায়। প্রথমে ফলের উপরিভাগে ধূসর সবুজ, পানি ভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। ক্রমশ সে দাগ বেড়ে ফলের প্রায় অর্ধাংশ ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত অংশ বাদামি হয়ে যায় এবং ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে।



চিত্র : নাবী ধ্বসা

প্রতিকার

- এ রোগ দেখা দিলে ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- নীরোগ বীজ ব্যবহার করে চারা তৈরি করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- রোগের লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে রিডোমিল গোল্ড বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ডায়থেন এম-৪৫ প্রভৃতি ৪ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

(১) টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা (Tomato Fruit Borer)

ক্ষতির লক্ষণ: ছিদ্রকারী স্ত্রী পোকা টমেটোর পাতার উপরে ও ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে। এক একটি স্ত্রী পোকা ৫০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে সক্ষম। ডিম থেকে কীড়া বের হয়। এ পোকার কীড়াগুলো ফল আসার আগে বিশেষ করে গাছের পাতা ও কচি ডগা খেয়ে বড় হয়। টমেটোর ফল আসার পরে এই পোকার কীড়াগুলি বেড়ে ওঠা ফলের ভিতর ঢুকে শাঁস ও বীজ খেয়ে থাকে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এদের আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।



চিত্র:আক্রান্ত ফল



চিত্র:টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা

- নিয়মিত পোকাসহ আক্রান্ত পাতা, ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ঝরে পড়া পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে উক্ত পোকার পূর্ণাঙ্গ মথ মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথকে সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায়। প্রতি ১ বিঘা জমিতে ১৫ টি ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যায়।
- আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে সাইপারমেথ্রিন গ্রপের কীটনাশক রিপকর্ড/সিমবুশ ১ মিঃলিঃ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(২) টমেটোর জাবপোকা

ক্ষতির লক্ষণ: পূর্ণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই টমেটোর পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়। এছাড়া জাব পোকা এই জাতীয় ফসলে মোজাইক রোগ ছড়ায়।



চিত্র : জাব পোকা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা: জাব পোকার আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন ফসলে জাব পোকা দমনের জন্য একতারা ২৫ ডব্লিউজি কার্যকরী ও অনুমোদিত। (২.৫ গ্রাম একতারা ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে সেপ্র করতে হবে।

৪.২.৭ ফসল সংগ্রহ ও ফলন

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে বাজার জাতকরণের জন্য। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।





চিত্র : পরিপক্কতার লক্ষণ **চিত্র :সংগ্রহকৃত টমেটো**

২০২৫

ফলন: জাত ভেদে ফলন ১৫-৫০ টন/একর হয়। মৌসুম, জাত, আবহাওয়া এবং পরিচর্যা অনুযায়ী প্রতি একর জমিতে ৫০ টনের বেশি টমেটো পাওয়া সম্ভব।

৪.৩ মরিচ (Chilli)





মরিচ বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের সব জায়গায়ই এর চাষ হয়। আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে কাঁচা মরিচের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। যে কোন বাড়ি/বাসার সামনে বা পিছনে সামান্য জমিতে সারা বছরই মরিচের চাষ করা যায়। বাড়ীর ছাদে বা বারান্দায় টবে কাঁচা মরিচের চাষ করে সারা বছরই কাঁচা মরিচের পারিবারিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

৪.৩.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল মরিচের উৎপত্তিস্থান।

ইংরেজি নাম: Chilli / Red pepper

বৈজ্ঞানিক নাম: *Capsicum frutescens*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম কাচা মরিচে ২-৩ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ৬ গ্রাম, ৭ গ্রাম আঁশ, স্নেহ ০.৬ গ্রাম, ভিটামিন এ ১০০-২০,০০০ (আই. ইউ.), থায়ামিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০৮ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ১.০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৫-২৮০ মিলিগ্রাম এবং পানি রয়েছে ৮০-৮৬ গ্রাম।

ব্যবহার: আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় মরিচের স্থান বেশ প্রচলিত। এটি বাংলাদেশের নিত্য ব্যবহৃত মশলা। মরিচ কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায় খাওয়া হয়। মরিচ শুধু মশলা বা রসনা তৃপ্তিতে ব্যবহার হয় না। পরিমিত এবং নিয়মিত খেলে এটি ভিটামিন এ, বি, সি এর যোগান দেয়। এছাড়া হজমশক্তি বাড়ায়, ফুসফুস সুস্থ রাখে, দেহ পুনর্গঠন করে।

জলবায়ু ও মাটি: মরিচ গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর ফসল। ফুল ধারণের সময় ৩৫-৪৫ ডিগ্রী সে তাপমাত্রা মরিচের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বৃষ্টিপাতের আধিক্য এবং মেঘলা আকাশ ফুল ধারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যে মাটিতে বেশি অম্ল আছে সে মাটি ছাড়া সব ধরনের মাটিতে মরিচ জন্মে। মরিচ চাষের জন্য জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ সুনিস্কাসিত দো-আঁশ মাটি সব থেকে উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়।

জাত পরিচিতি: সাধারণত মরিচকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ঝাল মরিচ ও মিষ্টি মরিচ। বাংলাদেশে ঝাল মরিচের ব্যবহার বেশি। ঝাল মরিচের জনপ্রিয় জাতগুলোর মধ্যে নাগা মরিচ, বগুড়ার মরিচ, বিজলী
১০২৫ মরিচ, ফরিদপুরীসহ ইত্যাদি জাত রয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক মৌসুমি জাতগুলো হলো- কামরাংগা,

আকালী, কালো মরিচ, ইত্যাদি। আঞ্চলিকভাবে আরো কিছু জাত রয়েছে, যেমন- বালিঝুরা মরিচ, সাহেব মরিচ, বোম্বাই মরিচ, ধানী মরিচ, পাটনাই, গোলমরিচ। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি উন্নত জাত রয়েছে। এগুলো হলো বারি মরিচ-১, বারি মরিচ-২, বারি মরিচ-৩।



নাগা মরিচ (সিলেট)



বারি মরিচ-১



বারি মরিচ-২

চিত্র : বিভিন্ন ধরণের মরিচ

৪.৩.২ উৎপাদন পদ্ধতি

৪.৩.২.১ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ সংগ্রহ: ভাল কোন উৎস হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

মরিচের বীজতলা তৈরি: মরিচের বীজ সরাসরি জমিতে বপণ করা যায় না, যার জন্য বীজতলা তৈরি করে নিতে হয়। বীজতলা তৈরির জন্য আদর্শ মাপ হলো ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া। তবে বীজতলায় চারার সংখ্যার উপর নির্ভর করে মাপ কম বেশি হতে পারে। গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা ১৫ সেঃমি এর বেশি নয় এবং শীতকালীন বীজতলার জন্য ৭-৮ সেঃ মিঃ হতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা বেশি থাকে।

বীজ শোধন: জমিতে বা বীজতলায় বীজ বপণের আগে মরিচের বীজ শোধন করে নিতে হয়। বীজ শোধন করে নিলে চারা অবস্থায় রোগ বালাই কম হয়ে থাকে। নিরোগ চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপণের আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম প্রোভেক্স-২০০ দ্বারা ৩০ মিনিট ভিজিয়ে তারপর ১০-১৫ মিনিট ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।

বীজহার: একবিঘা জমির চারার জন্য ১২০ থেকে ১৩০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

মরিচের বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি: বীজ বপণের উপযুক্ত সময়: বর্ষা মৌসুমের জন্য মার্চ - এপ্রিল মাস এবং রবি মৌসুমের জন্য অক্টোবর - নভেম্বর মাস। মিষ্টি মরিচ রবি মৌসুমেই ভালো জন্মে আর ঝাল মরিচ বছরের সবসময়ই জন্মে থাকে। ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর বীজ থেকে পানি ঝরিয়ে হালকা ছায়াতে শুকিয়ে ঝরঝরা করে বীজতলায় ছিটিয়ে দিতে হবে। মরিচ বপনের সময় মনে রাখতে হবে- বীজ কোনো ক্রমেই যেন ১-১.৫ সে.মি এর বেশি মাটির গভীরে না যায়। মরিচের বীজ সরাসরি বপণ করলে ১৫-২০ সে.মি. পরপর গাছ রেখে পাতলা করে দিতে হবে।

২০২৫

মরিচের চারা তৈরি ও রোপণ: বীজতলায় চারা যখন ১০ সে: মি: লম্বা হয় তখন চারা মুল জমিতে রোপণের উপযোগী হয়। মরিচ ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কারের পরে ৩-৪ টি চাষ এবং মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হয়।

৪.৩.২.১ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: মরিচ চাষের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং বর্ষায় পানি উঠে না। জমিতে পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে স্থানে প্রচুর রোদ ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে মরিচ চাষের জন্য সেই স্থান নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি: চারা প্রস্তুত হলে মূল জমির আগাছা পরিষ্কার করে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্ততির পর চারা রোপণ করা হয়।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মরিচ চাষে সার প্রয়োগের সময়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটা চারা লাগানোর পূর্বের সময় এবং অন্যটা চারা লাগানোর পরে। এ দুটি সময়ের করণীয় পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে। মরিচের জমিতে জমি তৈরির সময়/ মরিচের চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন পূর্বে প্রতি হেক্টরে গোবর ১০ টন, ইউরিয়া ২৫০ কেজি, টিএসপি ২০০ কেজি এবং এমওপি সার ১৫০ কেজি প্রয়োগ করা হয়। গোবর সারসহ অন্যান্য সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ২৫ দিন পর ৮৫ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫ কেজি এমওপি সার প্রথম উপরি প্রয়োগ করা হয়। লাগানোর ৫০ দিন পর ২য় ও ৭০ দিন পর তৃতীয় কিস্তির উপরি সার প্রয়োগ করা হয়। ২য় ও ৩য় কিস্তির প্রতিবারে ৮৫ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করা হয়। প্রতিবার সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েকদিন পর মাটিতে চটা ধরে। মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হয় যাতে করে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ: চারা রোপণে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭০ সে.মি. ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সে.মি. রাখতে হবে। চারা বিকেলে লাগাতে হবে এবং ২-৩ দিন সকাল বিকাল পানি দিতে হবে।

৪.৩.২.৩ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

শূণ্যস্থান পূরণ: কোন গাছ মরে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নস্ট হয়ে গেলে ৮-১০ দিনের মধ্যে সেখানে নতুন করে চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা দমন: আগাছা দেখা দিলে সময়মত নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরা করাটা হলো মরিচ গাছের পরিচর্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সারের উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: জমিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা লাগানোর পরে হালকা পানির সেচ দিলে চারা সহজেই সতেজ হয়। গ্রীষ্মকালে ৪ থেকে ৫ দিন এবং শীতকালে ১০ থেকে ১২ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। জমিতে বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে অতিরিক্ত পানি জমিলে অতি দ্রুত তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে গাছ মরে যেতে পারে। গাছের গোড়ায় অল্প সময়ের জন্য পানি জমে থাকলেও পাতা ঝরতে আরম্ভ করে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

১) ক্ষতিকর পোকামাকড়

বাংলাদেশে মরিচের উৎপাদন কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ। এসব পোকা মাকড়ের মধ্যে রয়েছে চুষি পোকা, লাল মাকড়, সাদা মাছি, জাব পোকা এবং ফলছিদ্রকারী পোকা। এসব পোকামাকড়ের মধ্যে শুধুমাত্র চুষিপোকা ও মাকড়ের আক্রমণের কারণে মরিচের ফলন পরিমাণগতভাবে প্রায় ৭৫-৮০ % হ্রাস পায়। নিম্নে মরিচের কিছু পোকা-মাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হল।

ক) জাব পোকা

ক্ষতির নমুনা: পূর্নাঙ্গ ও বাচ্চা পোকা পাতা, ফুল কচি ফল ও ডগার রস চুষে খায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি ও ফুল, ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়। এ পোকা থেকে নি: সৃত মধুরসে কালো শুটি মোল্ড ছত্রাক জন্মায়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশী ও মেঘলা আকাশ থাকলে পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

ব্যবস্থাপনা: আক্রমনের প্রাথমিক অবস্থায় হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা। লেডি বার্ড বিটলের পূর্নাঙ্গ ও কীড়া জাব পোকা খায় বিধায় এদের সংরক্ষণ ও সংখ্যা বাড়ানো গেলে জাবপোকা অতিদ্রুত দমন হয়। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীট নাশক ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র : জাব পোকা

খ) মরিচের থ্রিপস

ক্ষতির নমুনা: এরা রস চুষে খায় বলে আক্রান্ত পাতা রূপালী রং ধারণ করে। আক্রান্ত পাতায় বাদামী দাগ বা ফোঁটা দেখা যায়। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় ও ঢলে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা: সাদা রংয়ের আঠালো ফাঁদ ব্যবহার। ক্ষেতে মাকড়সার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পারফেকথিয়ন/মেটাসিসটক্স এক চা চামচ ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



চিত্র : থ্রিপস পোকা

২০২৫

গ) মরিচের মাকড়

ক্ষতির নমুনাঃ পাতার নীচে থেকে রস চুষে খায় ফলে পাতার শিরার মধ্যকার এলাকা বাদামী রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং কচি পাতার নীচের দিকে বেঁকে পেয়ালা আকৃতির হয়ে যায় ও পাতা সরু হয়। ব্যাপক আক্রমণে পাতা ভেঙ্গে যায়। ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়।

ব্যবস্থাপনা: আক্রমণের শুরুতে হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে নিম তেল ৫ মিলি+৫ মিলি ট্রিকস্ মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র : মরিচের মাকড়

২) মরিচের রোগ ও দমন পদ্ধতি

ক) এনথ্রাকনোজ: এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।

ক্ষতির নমুনা: চারা ও বয়স্ক গাছের পাতা, ডাল, ফুল ফল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতা ঝরে যায় ও ডগা উপর হতে মরতে শুরু করে। আক্রান্ত গাছ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে, দুর্বল হয়ে যায় ও ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এ রোগের আক্রমণে গাছ বড় হয় না ও আক্রান্ত গাছ দ্রুত মরে যায়। ফলের উপর গোলাকার কাল দাগ পড়ে এবং দাগের চারিদিকে গাঢ় হলুদ রিং বা বলয় থাকে। এ দাগ বৃদ্ধি পেয়ে ফল পঁচিয়ে দেয় ও ঝরে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা: সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছের পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে। ক্ষেতে রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র টিল্ট-২৫০ ইসি (০.০৫%) ব্যাভিস্টিন (০.১%) বা নোইন (০.২%) ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।



চিত্র : মরিচের এনথ্রাকনোজ রোগ

খ) ড্যাম্পিং অফ/গোড়া পচা/মুল পচা: চারা অবস্থায় ছত্রাক দ্বারা এই রোগ ঘটে থাকে।



চিত্র : মরিচের ড্যাম্পিং অফ/গোড়া পচা/মুল পচারোগ

ক্ষতির ধরণ: বীজ বপনের পর পরই বীজ পচে যেতে পারে অথবা চারা মাটি থেকে উঠার পরে চারা গাছ ফ্যাকাশে, লিকলিকে ও দুর্বল হয়। আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা: রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ) লিফ কার্ল: এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ক্ষতির নমুনা: যে কোন বয়সের গাছ আক্রান্ত হতে পারে তবে বয়স্ক গাছই বেশী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়িয়ে যায় ও সাধারণ পাতা অপেক্ষা পুরু হয়। পাতা কুঁকড়িয়ে যায় বলে গাছের সাধারণ বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও ফলন কমে যায়। গাছের পর্ব মধ্য ছোট হয় ও গাছ খাট আকারের হয়। ফুল ও ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।



চিত্র : মরিচের লিফ কার্ল

ব্যবস্থাপনা: আশপাশের সোলানেসি পরিবারের (বেগুন জাতীয়) অন্যান্য পোষক উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে। চারা অবস্থা থেকে পারফেকথিয়ন-৪০ ইসি বা টাফগার-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ১ লিটার পানিতে ১ মিলি স্প্রে করে বাহক পোকা দমন করতে হবে।

২০২৫

৪.৩.৩ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা: ফুল আসার পর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়। তবে মরিচের রং লাল হলে তুলে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি হেক্টরে কাঁচা ১০-১১ টন ও শুকনো ১.৫-২.০ টন ফলন হয়।

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: মরিচের রং লাল হলে তুলতে হবে।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: মরিচ সাধারণত অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত এবং শুকানো জায়গায় ২৮ সে. তাপমাত্রা ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১ থেকে ২ সপ্তাহ রাখলে মরিচের কোন ক্ষতি হয় না।



চিত্র : মরিচের পরিপক্কতার লক্ষণ

৪.৪ গোল আলু (Potato)



আলু বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফসল। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই চতুর্থ স্থানে আছে আলু। বাংলাদেশে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং দেশের সর্বত্রই এর চাষ হয়ে থাকে। অনুকূল আবহাওয়া ও বাজারজাতকরণের জন্য কিছু জেলায় এর চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াজাত আলু বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৪.৪.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: দক্ষিন আমেরিকা মহাদেশ আলুর আদি বাসস্থান। পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া এবং আশে পাশের অন্যান্য দেশের ইনকা নামক জাতি প্রায় আড়াই হাজার পূর্ব হতে আলুর চাষ করত বলে জানা গেছে।

ইংরেজি নাম: Potato

বৈজ্ঞানিক নাম: *Solanum tuberosum*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে ২.০ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ১৯.৪ গ্রাম, স্নেহ ০.১ গ্রাম, থায়ামিন ০.১১ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০২ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ১৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৯ মিলিগ্রাম এবং ক্যালরী রয়েছে ৮৮ গ্রাম।

ব্যবহার: আলু একটি স্টার্চ বা শ্বেতসার প্রধান খাদ্য এবং ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে আলু সাধারণত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন তরকারির সাথে খেতে খুবই মুখরোচক। পৃথিবীর অন্তত ৪০টি দেশে আলু মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। আলু সিদ্ধ করে, পুড়িয়ে, ভাজি করে রুটির সাথে, খিচুড়ি ও ভাতের সাথে জনপ্রিয়। এছাড়া চপ, সিংগারা, পুরি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

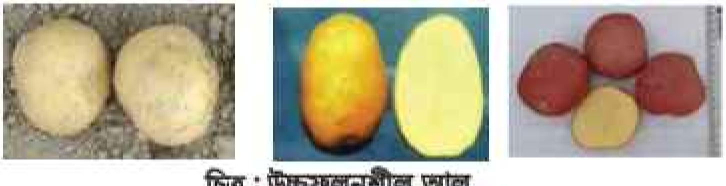
জলবায়ু ও মাটি: আলু চাষের জন্য তাপমাত্রা ও আলোর প্রভাব খুবই প্রকট, দেখা গেছে ১৫ ডিগ্রি - ২০ ডিগ্রি সে. গড় তাপমাত্রা আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার উপরে গেলে ফলন কমতে থাকে আবার ৩০ ডিগ্রি সে. এ আলু উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পায়। আলু ফসল যে কোন মাটিতে হতে পারে। তবে বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম। আলুর মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত, গভীর ও কিছুটা অম্লাত্মক হওয়া চাই। pH ৫.৫-৬.০ এর মধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এতে আলুর জন্য ক্ষতিকর রোগ স্ক্যাভিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উৎপাদন মৌসুম: বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাসের আগে আলু লাগানো যায় না, কারণ তার আগে জমি তৈরি সম্ভব হয় না। নভেম্বরের পরে আলু লাগালে ফলন কমে যায়।

জাত নির্বাচন: বাংলাদেশে যেসব জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে তা হলো দেশি জাত এবং উচ্চফলনশীল উন্নত জাত। বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু এবং ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

১) দেশি জাত: ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায় ও তুলনামূলকভাবে খেতে খুব সুস্বাদু। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি দামে বিক্রি হয়। দেশি জাতসমূহের মধ্যে চল্লিশা, দোহাজারী লাল, লাল পাকরী, লালশীল, পাটনাই, শীলবিলাতী ও সূর্যমুখী।

২) উচ্চফলনশীল: কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এপর্যন্ত আলুর মোট ৯১টি জাত (যার মধ্যে বারি আলু হিসেবে ৮০টি) অবমুক্ত বা বের করেছে। জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে খাবার আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলু, রপ্তানিযোগ্য আলু, রোগ প্রতিরোধী, আগাম আলু ও সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করাযায় এমন আলুর জাত। এদের মধ্য থেকে প্রয়োজন বা চাহিদা মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।



চিত্র : উচ্চফলনশীল আলু

১০৩৫

উৎপাদন পদ্ধতি

৪.৪.২. ১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

আলু বীজ সংগ্রহ ও পরিচর্যা: কোল্ড স্টোরেজ থেকে বীজ আলু বের করার পর ৪৮ ঘন্টা প্রি হিটিং রুমে রাখতে হবে। বীজ আলু বাড়ীতে আনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বস্তা খুলে ছড়িয়ে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্বাভাবিকভাবেবাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। কারণ বীজ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের করে বস্তা বন্ধ অবস্থায় রাখলে ঘেমে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র : বীজ আলু

বীজ শোধন: কোল্ড স্টোরেজে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু দাঁদ বা স্কাব এবং ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩% বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হয় (১ লিটার পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১০-১৫ মিনিট চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)। পলিথিন সিটের উপর আলু ছড়িয়ে স্প্রে করেও কাজটি করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আলুর সকল অংশ ভিজে যায়।

বীজের পরিমাণ: সাধারণত হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন বীজ আলু রোপণের জন্য প্রয়োজন ।

বীজ তৈরি: অঙ্কুর গজানোর পর ১ম কুঁড়িটি ভেঙ্গে নিতে হবে। কারণ ১ম কুঁড়ি ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্যান্য কুঁড়ি সমান ভাবে বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আলু ফসলের জন্য ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। কেটেও বীজ লাগানো যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কর্তিত অংশে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকে। বীজ লাগানোর ২-৩ দিন পূর্বে আলু কেটে ছায়াযুক্ত স্থানে আর্দ্র আবহাওয়ায় রেখে দিলে কাটা অংশের উপর একটা প্রলেপ পড়ে ফলে মাটি বাহিত রোগ জীবাণু সহজে বীজে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যভাবে পরিষ্কার ছাই মেখেও কাজটি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এক কেজি পরিষ্কার ছাই এর সাথে ১০০-২০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আলু পচন অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

৪.৪.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: উঁচু থেকে মাঝারী উঁচু জমি যেখানে সেচ ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে সেসকল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিটি অবশ্যই রৌদ্র উজ্জ্বল হতে হবে।

জমি তৈরি: মাটিতে জোঁ আসার পর লাঙ্গল বা যন্ত্র চালিত কর্ষণ যন্ত্র পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর দ্বারা গভীরভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে ৪টি চাষ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে বড় মাটির ঢেলা না থাকে এবং মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় থাকে।

৪.৪.৩ সার প্রয়োগ

৪.৪.৩.১ সারের পরিমাণ: দেশের বিভিন্ন স্থানের মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "সার সুপারিশ গাইড" অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। স্থানভেদে তা বিএআরসি এর সার সুপারিশ গাইডের সাথে মিল রেখে কম/বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	হেক্টর/কেজি	বিঘা/কেজি	শতক/কেজি
ইউরিয়া	৩২৫-৩৫০	৪৪.৭৮-৪৮.২৩	১.৩২-১.৪২
টিএসপি	২০০-২২০	২৭.৫৬-৩০.৩২	০.৮১-০.৮৯
এমওপি	২৫০-৩০০	৩৪.৪৩-৪১.৩২	১.০২-১.২২
জিপসাম	১০০-১২০কেজি	১৩.৭৮-১৬.৫৪	০.৪০-০.৪৯
জিংক সালফেট	৮-১০কেজি	১.১০-১.৩৮	০.০৩২-০.০৪০
বোরিক এসিড	৬-৯কেজি	০.৮৩-১.২৪	০.০২৪-০.০৩৭
গোবর	১০টন	১,৩৭৮.০০	৪১.০০

৪.৪.৩.২ সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট (প্রয়োজন বোধে) রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য বোরন ৮-১০ কেজি/হেক্টর প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

৪.৪.৪ চারা রোপণ

রোপণ সময়: বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর মাস) আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে এর আগে এবং পরেও আলু লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে কাংক্ষিত ফলন ও মান অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

রোপণ পদ্ধতি: সারি থেকে সারি দূরত্ব ৬০ সেমি। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব আস্ত আলু বীজের জন্য ২৫ সে.মি. এবং কাটা আলুর জন্য ১০-১৫ সে.মি.।

২০২৫

৪.৪.৫ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা: আলু উৎপাদনে আগাছা পরিষ্কার, সেচ, সারের উপরি প্রয়োগ, মাটি আলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেওয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যক। সময়মতো সবগুলো কাজ করতে পারলে খরচ কমে আসে, ফলন বেশি হয়। চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পর পর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে ভালো হয়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া: আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। জমিতে আলুর গাছ যখন ৫-৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২-১৫ সেন্টিমিটার হয় তখন দুই সারির মাঝখানের মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে নরম ঝুরঝুরা করে নিতে হয়। এই সময় জমির আগাছা নিধনের কাজও হয়ে যায়।

নরম ঝুরঝুরা মাটি কোদাল দ্বারা টেনে সারিতে গাছের দুই দিকে দেওয়া হয়। এর তিন সপ্তাহ পর গোড়ায় আবার মাটি দিতে হয়। গাছের বৃদ্ধি বেশি হলে আর একবার অর্থাৎ তৃতীয়বারের মতো মাটি দেওয়া হয়। গাছের গোড়ায় এইভাবে মাটি দিলে গাছের আলু পরিণত হবার সুযোগ পায়। মাটি ঠিকমতো দেওয়া না হলে বর্ধিষ্ণু আলু মাটির বাইরে এসে সবুজ রং ধারণ করে। এ রকম আলু খাবার অনুপোযোগী এবং কখনো কখনো তা বিষাক্তও হতে পারে।



চিত্র : আলু গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া

মালচিং:'মালচ' কথার অর্থ মাটি ঢেকে দেয়া। আর এ পদ্ধতিটিকে বলে মালচিং। মূলত পুরোনো, শুকনো বা কাঁচা পাতা, বিচালি বা খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে মাটি ঢেকে দেওয়ার পদ্ধতিই হলো মালচিং। মালচিং নতুন কোন পদ্ধতি নয়। অনেক আগে থেকেই খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গাছের বা চারাসহ সবজির গোড়া রসালো রাখতে মালচিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন গ্রামের কৃষকগণই। গ্রামের বেশিরভাগ কৃষকগণ স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে মালচিং করে থাকেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে স্থানীয় সম্পদ বা মালচিং উপকরণ কমে যাবার কারণে ও কৃষির আধুনিকীকরণ হওয়ায় বর্তমান দেশে প্লাস্টিক মালচিং-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমান সময়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদে কৃষকগণ প্লাস্টিক মালচিং বেশি ব্যবহার করছেন। মালচিং এর ফলে ফসলের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া, ভালো ফলনের জন্য মাটি ঢেকে দিয়ে আবাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়। মালচিং ব্যবহারের ফলে পানির ব্যবহার কম লাগে।

আগাছা দমন: বীজ বপনের ৬০ দিন পর্যন্ত আলুর ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। আলুর জমিতে আগাছা দমন আলাদাভাবে করার প্রয়োজন পড়ে না। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ও গোঁড়ার মাটি আলগা করে দেয়ার সময়ই আগাছা দমন হয়ে যায়।

সেচ ব্যবস্থাপনা: এদেশে অনেক চাষী বিশেষ করে যারা দেশী আলুর চাষ করেন তারা আলুর জমিতে সেচের পানি ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু অধিক ফলনশীল আলুর জাতে অধিক সার ব্যবহার করলে আলুর জমিতে পরিমাণ মতো পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। আলুর জমিতে সেচ দেওয়া বেশ সুবিধাজনক। সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দেওয়ার ফলে যে জুলি বা নালার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে দিলেই সারা ক্ষেত পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। বীজ রোপণের পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে সেচ দেওয়া উত্তম, তবে খেয়াল রাখতে হবে ক্ষেতে কোনভাবেই পানি না দাঁড়ায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানিতে নালা/ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত ডুবে যায়। স্টোলন বের হওয়ার সময় ২০-২৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলু রোপণের পর ৩০-৫০ দিনের সময়ে জমিতে কোন অবস্থায় রসের ঘাটতি এবং ৬০-৬৫ দিনের পর রসের আধিক্য হতে দেয়া যাবে না। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গুটি বের হওয়া পর্যন্ত এবং পরে আলু বৃদ্ধির সময় তৃতীয় বার সেচ দিতে হবে। জমি থেকে আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে মাটি ভেদে সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এতে আলুর পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে।

আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগ এবং সমন্বিত দমন ব্যস্থাপনা

আলু বীজ জমিতে বপন থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর রোগ দ্বারা আলু গাছ ও বীজ আলু আক্রান্ত হয়। আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগের মধ্যে আগাম ধবসা, নাবি ধ্বসা, ঢলে পড়া, দাঁদ, স্কাব বা ষ্টেম ক্যান্কার, আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ এবং বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগহলো অন্যতম। এসমস্ত রোগদমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কৃষক পর্যায়ে আলুর লাভজনক উৎপাদন ব্যাহত হয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থপনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. আলুর আগাম ধ্বসা রোগ (Early blight of potato)

ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়। এটিকে আলুর মড়ক রোগও বলে। আলুর টিউবার, পাতা ও কান্ড এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণ: আক্রান্ত গাছের পাতায় কিছু কিছু স্থানে বৃত্তাকার অথবা গরুর চোখের মনির মতো দেখতে দাগ সৃষ্টি হয়। দাগ গুলো কালো বা বাদামি রঙের হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের কান্ডতে ও এ ধরনের দাগ সৃষ্টি হয়। বয়স্ক পাতায় এই লক্ষণ প্রথমে দেখা যায়। রোগের ফলে আলুর আকৃতি ছোট হয়ে যায় ও ফলন কমে যায়।



চিত্র : আগাম ধ্বসা রোগের লক্ষণ

প্রতিকার: সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ।সময়মত সেচ প্রদান। পাতায় দাগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

২. আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late blight of potato)

এ রোগকে পটেটো ব্লাইট বা আলুর মড়কও বলে। ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ী। যেসব এলাকায় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি এবং তাপমাত্রা ৪ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৪০-৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) সেসব এলাকায় এ রোগ বেশি হয়। তবে গরম কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়ায় এ রোগের বিস্তার কমে যায়। এ রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দুই সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়।



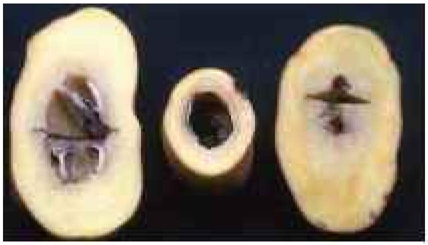
চিত্র : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ

লক্ষণ: আক্রান্ত গাছের পাতায় বা কান্ডে কালো ও পানি শোষণকারী ফোস্কা সৃষ্টি হয়। এ ফোস্কাগুলোতে সাদা স্পোর দেখতে পাওয়া যায় যা বাতাস বা পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মহামারী আকার ধারণ করলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা, বোঁটা এবং শাখায় ক্ষত দেখা দেয়। গোল বা অনিয়মতি আকৃতির এ ক্ষতের রঙ হতে পারে ঘন সবুজ, বেগুনী ও কালো।

প্রতিকার: রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ৪ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ রোগের জীবাণু শরীরে পুরো দেয়াল তৈরি করে কয়েক মৌসুম পর্যন্ত মাটিতে টিকে থাকতে পারে। এ কারণে এ জীবাণু নির্মুল করা কঠিন। তাই এ ছত্রাক প্রতিরোধী জাত আবাদ করাই সবচেয়ে ভালো।

৪. আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ (Hollow heart of potato)

অতি পরিমানে সেচ, মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার হলে এবং তাপমাত্রা ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগ আলুর টিউবারের কেন্দ্রে আঁকাবাঁকা অনিয়ত আকৃতির ফাঁপা অংশ সৃষ্টি করে। আলুর বীজ সঠিক সময়ের পুর্বে বপনের ফলে এ রোগ হয়।



চিত্র : আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ

কারণ: কোনো জীবাণুর কারণে এ রোগ হয় না। মূলত আলুর কন্দ বড় হওয়ার সময় ঠিকমতো মাটিতে রস না পেলে বা অনিয়মিত রস পেলে অথবা আবহাওয়াগত কারণে আলুর ভেতরে এ সমস্যা তৈরি হতে পারে। আলু বড় হওয়ার সময় মাটিতে পানির অভাব হলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও স্ট্রেস তৈরি হয়। অতিরিক্ত পানি বা বেশি শুষ্কতার কারণেও এমন হতে পারে। পানির অভাবের পর হঠাৎ করে প্রচুর পানি পেলে হঠাৎ করে আলু দ্রুত বড় হতে শুরু করে। তখন কেন্দ্রস্থলে ফাঁকা রেখে শরীরে বাড়ে আলু।

প্রতিকার: সঠিক সময়ে ও দূরত্ব বজায় রেখে বীজ বপন। পরিমিত পরিমাণে সেচ প্রদান ও সার প্রয়োগ।

আলুর পোকামাকড়: আলুর পোকা মাকড়ের মধ্যে কাটুই পোকা, জাব পোকা, সুতলি পোকাই প্রধান।

১) আলুর কাটুই পোকা: কাটুই পোকার কীড়া চারা গাছ কেটে দেয় এবং কন্দ ছিদ্র করে আলু ফসলের ক্ষতি করে থাকে। পোকার কীড়া দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে।



চিত্র : আলুর কাটুই পোকা

প্রতিকার: কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি না হলে কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত। কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি হারে ডারসবান ২০ ইসি মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। আলু লাগানোর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে।

২) আলুর জাব পোকা: পুর্ণ বয়স্ক জাব পোকা ও বাচ্চা উভয় অবস্থায় ক্ষতি করে পোকা পাতা, কান্ড ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। এই পোকা আলুর বিভিন্ন ভাইরাস রোগ ছড়ায়।



চিএ: আলুর জাব পোকা

২০২৫

প্রতিকার: আলু বীজ উৎপাদনের জন্য আলু ক্ষেতের জাব পোকা দমন করতে হবে। পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৩ থেকে ৪ মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন বা এসাটাফ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪.৬ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

৪.৬.১ পরিপক্বতার লক্ষণ: যখন দেখা যাবে আলু গাছগুলো হলুদ হয়ে মরে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে। সাধারণত আলু বীজ লাগাবার ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যেই এ আলু তোলা যায়।

আলু উঠানো/ সংগ্রহ: শুষ্ক, উজ্জ্বল ও ভালো আবহাওয়াতে আলু উত্তোলন করতে হবে। এক সারির পর এক সারি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে উঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আলু উঠানোর পর প্রখর রৌদ্রে রাখা যাবে না। মাঠে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে কাটা, ফাটা, আংশিক পচা আলু বাতিল হিসাবে পৃথক করতে হবে যেন ভাল আলুর গাদার সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। মাঠে বস্তায় অথবা চট দ্বারা আবৃত ঝুড়িতে ভরে সতর্কতার সাথে অস্থায়ী শেডে পরিবহন করে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর বস্তা বা ঝুড়ি আছড়িয়ে ফেলে আলু ফেটে বা আলুর ছাল উঠিয়ে থেতলিয়ে ফেলা না হয়। কেননা আলু থেতলিয়ে গেলে সংরক্ষণ করার সময় পচে যায়।

আলু সংরক্ষণ: সর্টিং-গ্রেডিং করার পর আলু নির্দিষ্ট সাইজের বস্তায় (৮০/৫০কেজি) করে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ আলু অবশ্যই কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কিছু পরিমাণ খাবার আলু উন্নত পদ্ধতিতে জাত ভেদে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণ: গোল আলু সংরক্ষণের এটি একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থায় খাবার ও বীজ এই দুই শ্রেণীর আলুই দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায়। হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ ইট দ্বারা নির্মিত একটি দালান ঘর যাতে শীতলতা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য এই ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এর দেয়াল ও ছাদে কোথায়ও কোনো ফাঁক না থাকে; তবে এমন নিয়ন্ত্রিত ফাঁক থাকে যার মাধ্যমে ভিতরের গরম আবহাওয়া এক্সজস্ট পাখার সাহায্যে বের করে দেওয়া যায়।

হিমাগারের তাপমাত্রা বীজ আলুর জন্য ৩.৩-৪.৪ ডিগ্রি সে. এবং খাবার আলুর জন্য ১২.৭-১৫.৫ সে. হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিমাগারের অভ্যন্তরে বাতাসের আদ্রতা ৮০%-৯০% হবে। আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারকে কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি কক্ষে উপর্যুপরি কয়েকটি মাচান (বাঁশের অথবা কাঠের) তৈরি করা হয় যাতে অধিক আলু গুদামজাত করা যায়।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণ: কৃষকরা সাধারণত হিমাগার অর্থাৎ কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ করেন। আবার অনেক কৃষক বাড়ীতেই আলু সংরক্ষণ করেন। কিন্তু অনেক সময় সংরক্ষণ পদ্ধতি সঠিক না হওয়ায় আলু পচে

২০২৫

যায়। বাড়িতে আলু সংরক্ষণ করতে হলে আলু সংগ্রহের সময় থেকেই বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যা নীচে দেওয়া হলো।

১)রোদ্রজ্জ্বল সকালবেলা আলু তুলতে হবে।

২) আলু পরিপক্ক হলে তোলার ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে গাছ আলাদা করতে হবে।

৩) তোলার সময় কোদাল বা লাঙল দিয়ে সাবধানে আলু তুলতে হবে যাতে আঘাতে আলু কেটে বা থেঁতলে না যায়।

৪) চটের বস্তায় ভরে আলু বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে।

৫) বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার ও শুকনা জায়গায় রেখে আকার অনুযায়ী (বড়, মাঝারি ও ছোট) গ্রেডিং করতে হবে।

সংরক্ষণের আগের কাজ

১) কাটা, ছাল ওঠা, পোকা ধরা ও রোগে ধরা আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

২) জমি থেকে আলু তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে ৭/৮ দিন ছায়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। একে কিউরিং বলে।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি

১) আলু সংরক্ষণের জন্য বাড়ীতে যে কোনো গাছের ছায়ায় একটি ছনের ঘর তৈরী করতে হবে।

২) মাটি থেকে ১০-১৫ সেন্টিমিটার (এক বিঘত) ওপরে একটি মাচা তৈরী করতে হবে।

৩) মাচা থেকে চাল পর্যন্ত বাঁশের বেড়া দিতে হবে। বাঁশের বেড়া এমনভাবে দিতে হবে যেন উপরের অংশের বেড়াতে যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁক থাকে যাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে।

৪) এভাবে তৈরী ঘরে ১৫০-২০০ মন আলু সংরক্ষণ করা যায়।

৫) সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হবে। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখামাত্র ফেলে দিতে হবে।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণের সুবিধা

১) বাড়ীতে আলু সংরক্ষণে খরচ কম। ছনের ঘর একবার তৈরী হলে সেখানে অনেক বছর আলু রাখা যায়।

২) কৃষক যে কোনো সময় আলু বিক্রি করতে পারেন। হিমাগারে গিয়ে আলু বের করার ঝামেলা থাকে না।

৩) হিমাগারে আলু নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতায়ত খরচ হয় না।



চিত্র : বাড়িতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি

বাড়িতে আলু সংরক্ষণের অসুবিধা

১) হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর চেয়ে বাড়িতে সংরক্ষিত আলুর ওজন কমে যায়।

২) আলু ৬ মাসের বেশী সংরক্ষণ করা যায় না।

আলুর উৎপাদন ও সংরক্ষণ

১) দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয়।

২) বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত আলুর ৪৮ শতাংশ হিমাগারে সংরক্ষিত হয়।

৩) অবশিষ্ট ৫২ শতাংশ আলু কৃষকগণ বাড়িতে সংরক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু হিমাগারে এবং বাড়ীতে সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছরই আলু ফসলেই ৫০ কোটি টাকারও বেশী অপচয় হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

১) বীজতলায় চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় চারাতে ৫-৬টি পাতা গজায়।

২) শীতকালীন বেগুনের জাতকে রেটুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৩) টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে।

৪) ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই টমেটো সংগ্রহ করতে হবে বাজারজাতকরণের জন্য।

৫) ফুল আসার পর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়।

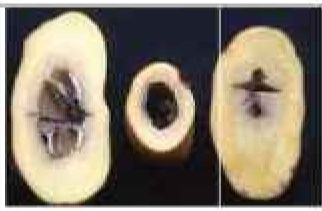
৬)বাংলাদেশে মরিচের উৎপাদন কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ।

৭) আলু গাছগুলো হলুদ হয়ে মরে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

৮) আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সোলানেসী পরিবারের বিভিন্ন সবজীর পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকামাকড় ও রোগবালাই উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগের নাম, লক্ষণ, ফসলের নাম/কোন ফসলে ক্ষতি করে ও প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা উল্লেখ কর।

ক্রমিক নং	ছবি	পোকা/রোগের নাম	লক্ষণ	প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা	কোন ফসলে ক্ষতি করে
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					

০৬					
০৭					

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তোমার পাশের বাড়ির রহিম চাচা তার ৫ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে চায়। নিম্নের প্রশ্নের আলোকে সফলভাবে টমেটো চাষের পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করো।

১) কোন জাতের টমেটো চাষ করবে?

২) যদি একটি আদর্শ বীজতলার পরিমাপ ৩ মিটার দীর্ঘ ও ১ মিটার প্রস্থ হয় তাহলে ৫ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে কতটি আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে?

২) অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী সারের পরিমাণ উল্লেখ করো।

৩) লিফ কার্ল ও ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কি কি করতে হবে।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বেগুনের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

২. বেগুন চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

৩. ফুল আসার পর কত দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়।

৪. আলু চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?

৫. কোন অবস্থায় টমেটো জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

৬. মরিচের উৎপত্তিস্থল কোথায়?

৭. হিমাগারে বীজ আলু রাখার উপযোগি তাপমাত্রা কত?

৮. কোন ধরনের মাটি বেগুন পরিবারের সবজি চাষের জন্য উপযোগী?

৯. চারা তৈরির জন্য বীজতলার আকার কত হলে ভালো হয়?

২০২৫

১০. মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয় বেগুনের এমন একটি রোগের নাম বল

১১. টমোটোর ২টি ভরা মৌসুমী জাতের নাম লিখ

১২. আলু পরিপক্ক হলে তোলার কত দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে গাছ আলাদা করতে হবে?

১৩.কিউরিং কী?

১৪. গ্রেডিং কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতি ১০০ গ্রাম টমেটোতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

২. বেগুন পরিবারের সবজি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা প্রয়োজন?

৩. বেগুনের চারা রোপণের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

৪. রেটুন কী?

৫. মরিচের বিভিন্ন জাতের নাম লিখ

৬.মালচিং কি? মালচিং এর উপকারিতা লিখ।

৭. আলোর ফাঁদ কী?

৮. হলুদ ফাঁদ সম্পর্কে লিখ?

৯. বাড়ীতে আলু সংরক্ষণের সুবিধা কী?

১০.হলোহার্ট কি? কারণ ও প্রতিকারের উপায় লিখ

১১. আলু ও বেগুনের ব্যবহার লিখ?

রচনামুলক প্রশ্ন

১। মরিচের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। টমেটা চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা করো।

৩। বেগুনের পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। টমেটোর চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। আলু চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা করো।

৬। বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ননা করো।

৭। মরিচের রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮। আলুর আগাম ধ্বসা রোগের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। বেগুন, মরিচ, টমেটো ও আলুর পরিপক্কতার লক্ষণ লিখ।

জব ৪.১: বেগুন/মরিচ/ টমেটোর/ বীজতলা এবং সুস্থ ও সবল চারা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১। বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে পারবে।

২০২৫

২। বীজতলার মাটি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। বীজতলায় বীজ বপন করতে পারবে।

৪। বীজতলার পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। সুস্থ ও সবল চারা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলার স্থান প্রস্তুত করা

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন সনাক্ত ও সংগ্রহ করা

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা

৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে বেগুন, টমেটো, মরিচ, অন্যতম। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। শুরুতেই বীজতলার স্থান নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া উচিত। বীজতলা এমন স্থানে তৈরী করতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়াবে না অর্থাৎ সুনিষ্কাশিত হতে হবে, সর্বদা আলো-বাতাস পায় অর্থাৎ ছায়ামুক্ত হতে হবে। দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলা যতদূর সম্ভব যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব সার, ৪। বীজ, ৫। বালি, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি/চাটাই, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। ইটের গুড়া, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। বেগুন/টমেটো/মরিচের/ বীজতলার জন্য অবশ্যই ছায়ামুক্ত উঁচু জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরীর জন্য ৩মিটার লম্বা ও ১মিটার চওড়া করে একটি আয়তকার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।

৩। এবার এর ৪ কোণায় ৪টি খুঁটি পুঁতে চারদিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।তারপর কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ইঞ্চি বা ১৫সেঃমিঃ গভীর করে মাটি খুড়ে তুলে ফেলতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরে বীজতলাকে সাজাতে হবে।

ক) সর্বনিম্নস্তর: প্রায় ৭.৫ সে:মি: বা ৩ইঞ্চি পুরাতন সুরকি, ভাংগাইট, পোড়ামাটি ইত্যাদি।

খ) মধ্যস্তর: ৭.৫সে:মি: বা ৩ইঞ্চি দো-আঁশ মাটি ও বালুর মিশ্রণ।

গ) উচ্চস্তর: ৭.৫সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি বেলে-দোআঁশ মাটি, পঁচাগোবর ও কম্পোষ্ট সারের মিশ্রন।

৪। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য সাদা উজ্জ্বল পলিথিন দিয়ে বীজতলা ৩-৪ সপ্তাহ ভালো ভাবে বায়ুরোধ করে ঢেকে রাখতে হবে। সুর্যের প্রচন্ড উত্তাপে ভেতরের জীবাণু মারা যাবে।

৫।শীতকালের জন্য বীজতলা সামান্য (৪-৫সেঃমিঃ) উচু এবং বর্ষাকালে একটু বেশি (৮-১০সেঃমিঃ) উচু করে প্রস্তুত করতে হবে।

৬। বীজতলায় রাসায়নিক সার মোটে ও দেয়া যাবে না। তবে জৈবসার বীজতলায় ২-৩ কেজিহারে প্রয়োগ করা উত্তম। এর সাথে ২০-৩০ গ্রাম কার্বোফুরান দিতে হবে।

৭।বীজতলায় বপনের পুর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজশোধন করে নিতে হবে।

৮। বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিস্কার বালি বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজবপন করতে হয়।

৯। বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্রনালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

১০। বাঁশের ফালি দিয়ে বীজতলার উপর ধনুকের মতো বাকিয়ে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর সাদা পলিথিন দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হয়।

১১। চারাগাছে ৪-৬টি পাতা বের হলেই তা রোপনের উপযুক্ত হয়।

সতর্কতা

১। বীজতলার জন্য ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবে না।

২। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। বীজ বপনের সাথে সাথে বীজতলায় সেচ দেয়া যাবেনা।

জব ৪.২: বেগুন/টমেটো/ মরিচ/আলু উৎপাদন কৌশলের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১। উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবে।

২। জমি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। মূল জমিতে চারা রোপণ করতে পারবে।

৪। ফসলের পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। পরিপক্কতার মানদন্ড অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

২০২৫

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা ।

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা।

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা।

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা।

৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা ।

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

সোলানেসী পরিবারের সবজিসমূহ যেমন- বেগুন, মরিচ, টমেটো ও আলু আমাদের দেশের জনপ্রিয় সবজি। এই সবজি গুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে। এই ধরনের সবজিসমূহ চাষের জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উপযোগী। সুনিস্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এটেল মাটি সমৃদ্ধ উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা এই ধরনের সবজি চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৬.৫ সোলানেসী পরিবারের সবজি চাষের জন্য উত্তম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। সুস্থ ও সবল চারা, ৫।মই, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। জৈব বালাইনাশক, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জমি নির্বাচন করতে হবে।

২। ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

৩।সারের পরিমান: টমেটো উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নরুপ সার প্রয়োগ করতে হবে

সারের নাম	সারের পরিমান/ হেক্টর
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ কেজি
এমওপি	২০০-৩০০ কেজি
গোবর	৮-১২ টন

৪। **সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** অর্ধেক গোবর সার ও সবটুকু টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পুর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশী ছাঁটাইয়ের পর চারা লাগানোর ৩য় সপ্তাহে ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়। ঘাটতি থাকলে জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড পাউডার এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সারও প্রয়োগ করতে হবে।

৫। চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪০ সেন্টিমিটার ।

৬। ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেডে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে।

৭। সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে।

৮। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৯। গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়।

১০। মরা পাতা ছাঁটাইসহ 'এ' আকৃতি বাঁশের খুটি দিয়ে ঠেকনা দেওয়া টমেটো গাছের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ।

১১। পরিপক্কতার মাত্রা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতা

১।ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবে না।

২। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। অতিরিক্ত পরিপক্ক করে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজি চাষ
(Cultivation of Cruciferous Vegetable)



সবজির সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমান বিবেচনা করলে ক্রুসিফেরি পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিবারের কয়েকটি সবজি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যাপক ভাবে চাষাবাদ করা হয় এদের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, চিনাকপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজিগুলো যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপি বেশি পাওয়া যায়। এ পরিবারের সবজিগুলো ফাইবার বা আঁশ, ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বলে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই অধ্যায়ে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপির চাষাবাদ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে-

১. ক্রুসিফেরি গোত্রের চাষযোগ্য সবজি সমূহের নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে

২. ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপির পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে

৩. উপরোক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু, মাটি, বিভিন্ন জাত এবং চাষাবাদের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে

৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় বীজতলা ও জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা উৎপাদন, রোপণ ও আন্ত: পরিচর্যার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে

৫. ফসলের পরিপক্কতার লক্ষণ, ফসল সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষণ কৌশলের বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারবে

২০২৫

৫.১. ফুলকপি

ফুলকপি শীতের প্রধান জনপ্রিয় সবজি। খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার তরকারি, স্যুপ, বড়া হিসেবে খাওয়া যায়। তবে শীতের সবজি হলেও ফুলকপি এখন গ্রীষ্মকালেও উৎপাদিত হচ্ছে।



চিত্রঃ ফুলকপি

৫.১.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (মরক্কো, সাইপ্রাস, ইতালি) ফুলকপির উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইংরেজি নাম: Cauliflower

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea var botrytis*

গোত্র: Cruciferececae

পুষ্টিমান: ফুলকপিতে যথেষ্ট পরিমাণে সালফার, পটাশিয়াম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এ ছাড়াএর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে আছে পানি ৯০.৮ গ্রাম, আমিষ ২.৬ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শ্বেতসার ৪.০ গ্রাম, খনিজ লবণ ১.৯ গ্রাম ইত্যাদি।

৫.১.২ জলবায়ু ও মাটি

ফুলকপির সাথে জলবায়ু বিশেষভাবে তাপমাত্রার সম্পর্ক নিবিড় ও জটিল। ফসল উৎপাদনের সফলতা বা বিফলতা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ফুলকপি চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরুপ জায়গা ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম। ফুলকপির জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু ভালো। তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম। ফুলকপি চাষের মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। মাটির অম্লতা ৬.০-৬.৫ ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।

৫.১.৩ জাত

এ দেশে এখন ফুলকপির পঞ্চাশটিরও বেশি জাত পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালেই আগাম, মধ্যম ও নাবী মৌসুমে বিভিন্ন জাতের ফুলকপি আবাদ করা যায়। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী জাতও আছে। ফুলকপির বিভিন্ন জাত আছে যেমন –

২০২৫

১. আগাম জাত- অগ্রাহনী, আর্লি পাটনাই, আর্লি স্নোবল জাত। এসব জাতের বীজ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বুনতে হয়।

২. মধ্যম আগাম জাত- পৌষালী, রাক্ষুসী, স্নোবল ওয়াই ইত্যাদি। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হলো এসব জাতের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

৩. নাবী জাত- মাঘী, বেনারসি, হোয়াইট মাউন্টেন জাত। এসব জাতের বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হলো আশ্বিন-কার্তিক মাস।

এ জাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বারি ফুলকপি-১ (রোপা) ও বারি ফুলকপি-২ (অগ্রদূত) নামে আগাম জাতের ফুলকপির দুইটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়।

৫.১.৪ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: ফুলকপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত। সমপরিমাণ বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজের হার: এক শতক জমিতে রোপণের জন্য ২ থেকে ২.৫ গ্রাম বীজের চারার প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে একর প্রতি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

চারা উৎপাদন: চারায় ৫-৬টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণত ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা হয়।

৫.১.৫ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ফুলকপি চাষের জন্য রৌদ্রময় স্থান নির্বাচন করতে হয়। গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১.০-১.২ কেজি	২৫০-৩০০ কেজি
টি এস পি	০.৬-০.৮ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.০ কেজি	২০০-২৫০ কেজি
বোরাক্স/সোহাগা	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৬০-৮০ কেজি	১৫-২০ টন

২০২৫

সার প্রয়োগ: জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর। তবে পুরো বোরাক্স বা বোরন সার জমি তৈরির সময় দিয়ে দিলেও অসুবিধে নেই।

চারা রোপণ

জাত ও রোপণের সময় অনুযায়ী চারা রোপণের দুরুত্ব নির্ণয় করতে হয়। আগাম জাতের গাছ সাধারণত আকারে ছোট হয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত ঘন করে লাগাতে হয়। মূল জমিতে চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট। নাবি জাতের সারি ও চারার মধ্যে যথাক্রমে ৭৫ ও ৫০ সেমি ব্যাবধান রাখা যেতে পারে। চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে অথবা বেঁকে না যেতে পারে। কেননা এর ফলে মাটিতে চারার প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।



চিত্র: সুস্থ ও সবল চারা রোপণ

৫.১.৬ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।



চিত্র: অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

বিশেষ পরিচর্যা

ফুলকপি গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। তবে ফুলকপির ফুল সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থায় চারদিক থেকে পাতা টেনে বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। সূর্যের আলো সরাসরি ফুলে পড়লে ফুলের রং তথা ফুলকপির রং হলুদাভ হয়ে যাবে।

৫.১.৭ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত সমস্যা

মাটিতে গৌণ পুষ্টি উপাদান বোরন এবং মলিবডেনামের ঘাটতি থাকলে ফুলকপির গাছ সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।বোরনের অভাবে ফুলকপির গঠন ভালো হয় না। ফুলকপির রঙ বাদামি বর্ণের হয়, ফুলকপির ভেতরটা ফাঁপা হয় এবং ফুলকপি পচে যায়।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিন গ্রাম বোরাক্স (সোহাগা) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার চারা গাছে এক বার, চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর এক বার এবং ৬/৭ সপ্তাহ পর আরেকবার গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে।

মলিবডেনামের অভাবে ফুলকপির পাতা সরু হয়ে যায় ও বেঁকে যায়। কখনও কখনও পাতা কুঁকড়ে যায়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সোডিয়াম মলিবডেট আধা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বোরাক্সের সঙ্গে স্প্রে করা যেতে পারে।

ব্লানচিং (Blanching)

ফুলকপির ফুল রোদে উন্মোচিত হলে তার বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়। এতে স্বাদ কমে না গেলেও আকর্ষণীয়তা অনেকাংশেই কমে যায়। ফলে ফুলকপির বাজার দরও কমে যায়। কেননা ক্রেতারা সবসময় আকর্ষণীয় ও ধবধবে সাদা ফুলকপি পছন্দ করেন। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য চারপাশের কয়েকটি পাতাকে টেনে এনে যখন ফুল ঢেকে দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই ব্লানচিং বলে। ফসল সংগ্রহের সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ছায়াবৃত থাকলেই কপির সাদা বর্ণ বজায় থাকে।



চিত্র: ফুলকপির ব্লানচিং

৫.১.৮ পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

ফুলকপির লেদা পোকা: পোকা গাছের কচি পাতা, ডগা ও পাতা খেয়ে নষ্ট করে।

প্রতিকার

১। পোকার ডিম ও লেদা হাত দারা বাছাই করতে হবে।

২। ফুলকপি চাষের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। পোকার আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা। যেমন- সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফুলকপির কাটুই পোকা: কাটুইপোকার কীড়া চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়।

প্রতিকার: জমিতে সন্ধ্যার পর বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ (১ কেজি চালের কুঁড়া বা গমের ভূসির সাথে ২০ গ্রাম সেভিন নামক কীটনাশক পানি বা চিটাগুড়ের সাথে ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র: ফুলকপির লেদা পোকা



চিত্র: ফুলকপির কাটুই পোকা



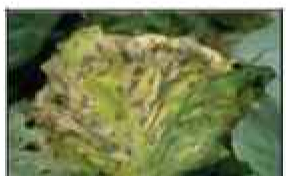
চিত্রঃ ফুলকপির জাবপোকা



চিত্র: ফুলকপির গোড়া পচা রোগ



চিত্র: ফুলকপির কার্ড বা মাথা পচা রোগ



চিত্র: অল্টারনারিয়া স্পট বা পাতায় দাগ রোগ

ফুলকপির জাবপোকা: জাবপোকা গাছের পাতা ও কচি ডগার রস শুষে খায়।

প্রতিকার

১। ফুলকপি চাষের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। জৈব বালাইনাশক ব্যবহার। যেমন- নিম পাতার রস, আতা গাছের পাতার রস, সাবানের গুড়া পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যায়।

৩। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক দিতে হবে। যেমন-ইমিডাক্লোপ্রিড (টিডো /ইমিটাফ) ০.৫ মিলি/লিটার পানি অথবা সবিক্রন ১ মিলি/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফুলকপির গোড়া পচা রোগ

লক্ষণ

১। আক্রান্ত চারার গোড়ার চারদিকে পানিভেজা দাগ দেখা যায় ।

২। আক্রমণের দুইদিনের মধ্যে চারা গাছটি ঢলে পড়ে ও আক্রান্ত অংশে তুলার মতো সাদা মাইসেলিয়াম (ছত্রাক) দেখা যায় ও অনেক সময় সরিষার মত ছত্রাকের অনুবীজ পাওয়া যায়।

৩। শিকড় পচে যায়, চারা নেতিয়ে পড়ে গাছ মারা যায় ।

৪। স্যাতস্যাতে মাটি ও মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে রোগের প্রকোপ বাড়ে ।

৫। রোগটি মাটি, আক্রান্ত চারা ও পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে ।

৬। চারা টান দিলে সহজে মাটিথেকে উঠে আসে।

প্রতিকার

১। পরিমিত সেচ ও পর্যাপ্ত জৈব সার প্রদান করা ও পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখা।

২। সরিষার খৈল প্রতি হেক্টরে ৩০০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

৩। প্রতি লিটার পানিতে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে মাটিসহ ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফুলকপির কার্ড বা মাথা পচা রোগ

লক্ষণ

১। ফুলকপির কার্ডে প্রথমে বাদামি রঙের গোলাকৃতি দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে একাধিক দাগ মিশে বড় দাগের সৃষ্টি করে।

২। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে কার্ডে দ্রুত পচন ধরে নষ্ট হয়ে যায়।

৩। আক্রান্ত কার্ড বা মাথা থেকে খুব কম পুষ্পমঞ্জরি বের হয়। ফলে এটি খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

প্রতিকার

১। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

২। বীজ বপনের আগে প্রোভ্যাক্স বা নোইন প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৩। কার্বেন্ডাজিম ছত্রাকনাশক ০.২% হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ওষুধ প্রয়োগের ৫ দিন পর পর্যন্ত ফসল তোলা যাবে না।

২০২৫

অল্টারনারিয়া স্পট বা পাতায় দাগ রোগ

লক্ষণ

অল্টারনারিয়া ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। চারা অবস্থায় এই রোগের আক্রমণ হলে চারা গাছ খাটো হয়ে যায় বা মরে যায়। চারা রোপণের পর গাছ আক্রান্ত হলে পাতায় প্রথমে আলপিনের মাথার মতো বিন্দু বিন্দু বাদামি রঙের দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগগুলো বড় হতে হতে ৫ সেমি ব্যাস পর্যন্ত হলদে রং ধারণ করে পরে ধীরে ধীরে দাগসমূহ গোলাকার চাক চাক বাদামি রঙের দাগে পরিণত হয়।

প্রতিকার

১। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বপনের আগে কার্বেনডাজিম প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে দিতে বীজ শোধন করতে হবে।

৩। সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।

৪। রোগের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

৫.১.৯ কপি জাতীয় ফসল চাষে রোগ আক্রমণের পূর্বে করণীয়

১. একই জমিতে বার বার কপি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না;

২. দিনের বেশির ভাগ সময় ছায়া পড়ে এমন জমিতে কপি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না;

৩. পরিমিত সেচ ও পর্যাপ্ত জৈব সার প্রদান করা ও পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখা;

৪. সরিষার খৈল ৩০০ কেজি/ হেঃ হারে জমিতে প্রয়োগ করা;

৫. বীজতলায় হেঃ প্রতি ২.০ টন ভার্মি কম্পোস্ট বা ট্রাইকো-কম্পোস্ট ব্যবহার করা;

৬. রোদ-তাপ, গরম পানি, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে;

৭. লাল মাটির ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি তিন বছরে একবার);

৮. বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করার জন্য বীজতলায় খড় বা ক্ষেতে শুকনো কাঠের গুড়া ৩ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে পোড়ানো;

৯. বপনের আগে প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৫.১.১০ ফসল সংগ্রহ ও ফলন

রোপণের আড়াই থেকে তিন মাস পর ফুলকপি সংগ্রহ করতে হবে। সাদা রঙ ও আঁটো সাঁটো থাকতে থাকতেই ফুলকপি তুলে ফেলা উচিত। মাথা ঢিলা ও রঙ হলদে ভাব ধরলে দাম কমে যায়। একর প্রতি ফলন ১৫-২৫ টন, হেক্টরে ৩৫-৬০ টন।



চিত্র: পরিপক্ক ফুলকপি

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।
২। মাটির অম্লতা ৬.০-৬.৫ ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।
৩। সাদা রঙ ও আঁটো সাঁটো থাকতে থাকতেই ফুলকপি তুলে ফেলা উচিত।

৫.২. বাঁধাকপি

কপি গোত্রের সবজির মধ্যে বাঁধাকপি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর সবজি বাংলাদেশে উৎপাদিত বাঁধাকপির প্রায় সব জাতই বিদেশী ও হাইব্রিড বাঁধাকপি শীতকালীন সবজি হলেও এখন এর কিছু বারোমাসি জাত রয়েছে। “কেকে ক্রস” জাতের বাঁধাকপি গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। এই জাতের প্রতিটি বাঁধাকপির গড় ওজন প্রায় ৬০০-৭৫০ গ্রাম।



চিত্র: বাঁধাকপি

৫.২.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : ইউরোপ মহাদেশকে বাধাঁকপির উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইংরেজি নাম: Cabbage

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea var capitata*

গোত্র: Cruciferececae

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে ৯১.৯ গ্রাম পানি, ১.৮ গ্রাম আমিষ,০.১ গ্রাম চর্বি, ০.৬ গ্রাম খনিজ, ১.০ গ্রাম আঁশ, ৪.৬ গ্রাম শ্বেতসার রয়েছে। খনিজ লবনের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ৩৯ মিগ্রা, ম্যাগনেসিয়াম ১০ মিগ্রা, ফসফরাস ৪৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৮ মিগ্রা, সোডিয়াম ১৪.১ মিগ্রা, কপার ০.০৮ মিগ্রা ও সালফার ৬৭ মিগ্রা।

৫.২.৩ জলবায়ু ও মাটি: বাঁধাকপির ভৌগলিক বিস্তার খুব বেশি। বিষুব রেখা থেকে শুরু করে হিমরেখা পর্যন্ত সর্বত্রই এর চাষ হয়। ফুল ধরার পূর্বে খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা হয় বলে সব দেশেই বছরের কোন না কোন সময় এর চাষ করা যায়। সব ধরণের মাটিতেই বাঁধাকপি চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মাটি বাঁধাকপি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। অত্যধিক বেলে মাটি ও লাল মাটিতে বাঁধাকপি ভাল জন্মে

১০২৫

না। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির অম্লতা ৫.০-৬.৫ বাঁধাকপি চাষের জন্য উত্তম।

৫.২.৪ জাত

আমাদের দেশে বাঁধাকপি চাষের জন্য নানান ধরনের জাত রয়েছে। এ সকল জাতগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। আগাম জাত
২। মধ্যম জাত
৩। নাবী জাত।

আগাম জাত
আগাম জাতগুলো হলোঃ কে কে ক্রস, সুপার গ্রীন এফ-১, ইপসা বাধাকপি-১ জাত।

মধ্যম সময়ের উপযোগী জাত

মধ্যম সময়ের উপযোগী জাতগুলো হলো: এটলাস ৭০, কে ওয়াই ক্রস, প্রভাতী ইত্যাদি।

নাবী জাত

নাবী জাতগুলো হলো: লিও ৮০, সেভয়, ড্রাম হেড ইত্যাদি।

বীজ উৎপাদনের জাত

বীজ উৎপাদনের জাতগুলো হলো: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী), বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত), ইপসা বাঁধাকপি-১ ইত্যাদি।

৫.২.৫ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: বাঁধাকপির চারা প্রথমে বীজতলায় উৎপাদন করতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার জন্য বালি, মাটি ও জৈবসার ভালাভাবে মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে নিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত।

বীজের পরিমান: জাত ভেদে শতক প্রতি ১.৫-২ গ্রাম বীজ লাগে।

বীজ বপন সময়: আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্যম জাত আশ্বিন-কার্তিক থেকে কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

৫.২.৬ জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি তৈরি: বাঁধাকপি চাষ পদ্ধতি এর জন্য প্রধান কাজ হলো জমি তৈরি করা। জমি তৈরির জন্য গভীর ভাবে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সাথে জমিতে প্রয়োজনীয় সার সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জমি তৈরি হয়ে গেলে মাটি থেকে ১৫-২০ সে.মি. উঁচু ও এক মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বেড থেকে বেডের মাঝখানের দুরত্ব কমপক্ষে ৩০ সে. মি. রাখতে হবে এবং বেডের মাঝে নালা রাখতে হবে।

চারা রোপণ: চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপন করতে হবে। রোপণের জন্য সারি থেকে সারির দুরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার দিলে ভাল হয়। প্রতি শতকে ১৫০টির মত বাঁধাকপির চারার প্রয়োজন হয়।চারা বিকেল বেলাতে জমিতে রোপণ করতে হয়।

৫.২.৭ সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১ কেজি	৩৫০ কেজি
টি এস পি	০.৮ কেজি	২৫০ কেজি
এমওপি	০.৬৫ কেজি	২৫০ কেজি
বোরাক্স/সোহাগা	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৫০-১০০ কেজি	৫-১০.০ টন

সম্পূর্ণ গোবর ও টি এস পি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এম ও পি সার ২ কিস্তিতে চারা রোপণের ২০ থেকে ২৫ দিন পর একবার এবং ৩০ -৪০ দিন পর আর একবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার দেওয়ার পরপর হালকা সেচ দিতে হবে।

৫.২.৮ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনায়

সেচ: বাঁধাকপি গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হবে। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন পানি বেশি সময় ধরে জমে না থাকে।

আগাছা: সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।চারা অবস্থা থেকে বাঁধাকপির মাথা বা হেড গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ: অতি বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.২.৯ পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা:

পোকামাকড়

কপির লেদা পোকা

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কপির কাটুই পোকা

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

জাব পোকা

হলুদ রং এর আঠালো ফাদ ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক যেমন এডমায়ার ৭-১০ মিলিলিটার / ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগবালাই

মোজাইক ভাইরাস রোগ

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার) ১০ মি.লি./ ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।

বাঁধাকপির অল্টারনারিয়া জনিত পাতার দাগ রোগ

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে তাই এ সময় ফসল তোলা যাবেনা।

গোড়া পচা রোগ/ ডেম্পিং অফ

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রানাশক যেমনঃ এমকোজিম ৫০; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি/ ২ মুখ ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

সতর্কতা

বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়তে হবে এবং নির্দেশাবলি মেনে চলতে হবে। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধাণ করতে হবে। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে ৭ থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করতে হবে।

৫.২.৭. ফসল সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষন

চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পর বাঁধাকপি সংগ্রহ করা যায়। পরিপক্বতার সময় বাঁধাকপির হেড বা মাথা দৃঢ় ও কমপেক্ট হবে এবং হালকা সবুজ রং ধারন করবে। প্রতিটি বাঁধাকপি গড়ে ২.৫ কেজি হয়। ফলন এক শতকে ১৫০-১৮০ কেজি, হেক্টরে ৭৫-৮০ টন, প্রভাতী জাতের ফলন ১০০-১১০ টন/হেক্টর। ফসল তোলার পর ছায়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিন। বেশি দিন সংরক্ষণ এর জন্য হিমাগারে রাখতে হবে।



চিত্র: পরিপক্ক বাঁধাকপি

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির পিএইচ ৫.০-৬.৫ বাঁধাকপি চাষের জন্য উত্তম।

২। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপন করতে হবে।

৩। বাঁধাকপির হেড দৃঢ় ও শক্ত এবং হালকা সবুজ রঙ ধারন করলে তুলে ফেলা উচিত।

৫.৩. ব্রোকলি

ব্রোকলি দেখতে ফুলকপির মতই, তবে রংটা সবুজ। এর বর্ণ সবুজ বলে অনেকেই একে সবুজ ফুলকপি বলে। চাইনিজ খাবারের ব্যবহৃত অন্যতম প্রধান উপকরণ এই সবজি। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের কাছে ব্রোকলি এখনো তেমন পরিচিত নয়। চমৎকার এই সবজিটি এখন বাংলাদেশেই চাষ হচ্ছে এবং এটি দেশের চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোর চাহিদা মিটিয়ে এখন দেশের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে।পুষ্টির দিক দিয়েও ব্রোকলি অনেক সমৃদ্ধ। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, সি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে এবং এর গন্ধটাও আকর্ষণীয়। ব্রোকলি ফুলকপির মত অত বড় হয়না। নিয়মিত ব্রোকলি খেলে তারুন্যতা বৃদ্ধি পায়।



চিত্র: ব্রোকলি

৫.৩.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তিস্থল: ব্রোকলির উৎপত্তি ইতালি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইংরেজি নাম: Broccoli

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea* var *italica*

গোত্র: Crueiferceae

৫.৩.২. পুষ্টিমান

ব্রোকলিতে যথেষ্ট পরমিাণে সালফার, পটাশয়িাম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এ ছাড়াএর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে আছে ৩২ কিলো ক্যালোরি খাদ্যশক্তি, পানি ৯০.৮ গ্রাম, আমিষ ৩.৩ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শ্বেতসার ৫.৫ গ্রাম, আয়রন ১.৬ গ্রাম, খনিজ লবণ ০.২১ গ্রাম ইত্যাদি।

৫.৩.৩. জলবায়ু ও মাটি

সাধারণভাবে যে ধরনের জলবায়ুতে ফুলকপির চাষ হয় সেখানে ব্রোকলিও ভাল জন্মে। তবে ব্রোকলির পরিবেশিক উপযোগিতার সীমা একটু বেশি বিস্তৃত। পানি জমে না এরূপ উঁচুজমি, উর্বর দোআঁশ মাটি হলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। ব্রোকলির গাছ ১৫-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভাল জন্মে। ব্রোকলি এপ্রিল মাসের পরেও ভালো ফলন দিতে পারে।দেশের সব অঞ্চলেই ব্রোকলি চাষ করা যেতে পারে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

৫.৩.৪. ব্রোকলির জাত

সাধারণত আঁটসাঁটো মাথার ছোট আঁকারের গাড় সবুজ বা নীলাভ সবুজ রঙের ব্রোকলি জাতের চাহিদা বেশি। উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছে- প্রিমিয়াম ক্রপ, গ্রিনকমেট, ইতালিয়ান গ্রিন ইত্যাদি।এর সবগুলো জাতই বিদেশ থেকে আমদানি করা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট বারি ব্রোকলি ১ নামে একটি জাত বের করেছে।

৫.৩.৫. বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: পাতা পঁচা সার বা গোবর সার ১ ভাগ, বালু ১ ভাগ ও মাটি ২ ভাগ মিশিয়ে ব্রোকলির বীজতলা তৈরি করতে হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ব্রোকলির চারা রোপণ করা যায়। কম বয়সের চারা দ্রুত বাড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে যখন বৃষ্টি কমে আসে তখন উঁচু জমি দেখে বীজতলা করা যায়। বীজতলায় ১ মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের মাটি ভাল করে কুপিয়ে ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি বর্গমিটারে ৪ থেকে ৫ কেজি গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে বেড সমান করে কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

বীজের হার: এক হেক্টর জমির চারার জন্য বীজতলায় ২৫০ থেকে ৪০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। আগাম মৌসুমে বৃষ্টি হলে বীজতলায় পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির সময় চারাকে রক্ষা করতে হবে। চারা রোপনের সময় হিসাব করে চারা উৎপাদন করতে হবে।

চারা উৎপাদন: চারায় ৫-৬টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণত ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা হয়।

৫.৩.৬. জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ব্রোকলি ঠান্ডা আবহাওয়ার ফসল বলে বাংলাদেশে শুধু রবি মৌসুমে এর চাষ হয়। ব্রোকলির চাষ অবিকল ফুলকপির মতোই। সারাদিন রোদ পায় এমন জমি ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। লাঙ্গল বা টিলার দিয়ে মাটি ওলট পালট করে কয়েকদিন রোদে ফেলে রাখতে হবে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেডে চারা রোপণ করাই ভালো। সেচ দেয়া এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা অত্যন্ত জরুরি।

চাষ দেয়ার সময় শতকে ২৫ থেকে ৪০ কেজি পচা গোবর বা খামারজাত সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটির সব ঘাস, শিকড়, আগাছা, আবর্জনা, পরিষ্কার করে ঢেলা ভেঙে ফেলে সমান করতে হবে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।চারা রোপনের পূর্বে গোড়ার দিকে দু-একটি বড় পাতা কেটে বাদ দিলে চারা কম মরবে।চারার মাথা থেকে নতুন পাতা ছাড়া শুরু হলেই বুঝতে হবে চারা মাটিতে লেগে গেছে এবং নতুন শিকড় ছেড়ে মাটি থেকে খাবার ও পানি গ্রহণ শুরু করেছে।

সার প্রয়োগ

ব্রোকলির জন্য অন্যান্য সার খুবই উপকারী। ইউরিয়া সারের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে ফলন ও বাড়ে। জমি তৈরির সময় ও পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	২.৫ কেজি	২৫০ কেজি
টি এস পি	১.৫ কেজি	১৫০ কেজি

২০২৫

এমওপি	২ কেজি	২০০ কেজি
বোরাক্স	১০ গ্রাম	১০.০ কেজি
গোবর	১৫০ কেজি	১৫ টন

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর। তবে পুরো বোরাক্স বা বোরন সার জমি তৈরির সময় দিয়ে দিলেও অসুবিধে নেই। আর সে সময় দিতে না পারলে পরবর্তীতে ১ম ও ২য় কিস্তিতে সার দেওয়ার সময় প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ গ্রাম বোরিক পাউডার গুলে পাতায় স্প্রে করে দেওয়া যায়। তবে সকালে শিশির ভেজা পাতায় যেন দানা সার না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫.৩.৭. চারা রোপণ

চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব দেয়া লাগে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট। চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে অথবা বেঁকে না যাতে পারে। কেননা এতে মাটিতে চারার প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।

৫.৩.৮. অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। জমি শুকনো দেখলে সেচ দিতে হবে। সার দেয়ার ঠিক আগে আগাছা নিড়ানো ভালো। এতে সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশতে পারে এবং সারের অপচয় কম হয়। গাছের পাতা পরিপূর্ণভাবে ছড়ানোর পুর্ব পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ব্রোকলি একটি অগভীর মূলী ফসল। তাই গাছের গোড়ার কাছাকাছি মাটি ৫ সেন্টিমিটারের বেশি গভীর করে নিড়ানো যাবেনা। যদি বেড বা জমির মাটি শক্ত হয়ে চটা বেঁধে যায় তবে অবশ্যই নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে তা ভেঙে দিতে হবে।

৫.৩.৯. পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

ব্রোকলি চাষের সময় জমিতে পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশে ব্রোকলির সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হল মাথা খেকো লেদা পোকা। এছাড়াও আরও অন্যান্য পোকার মধ্যে রয়েছে লেদাপোকা, বিছাপোকা, ঘোড়া পোকা ইত্যাদি।

এছাড়া ব্রোকলির বিভিন্ন ধরণের রোগের মধ্যে আছে পাতায় দাগ ও কালো পচারোগ প্রধান সমস্যা। এছাড়া চারা ধ্বসা, মোজাইক, ইত্যাদি রোগ দ্বারা আক্রমণ হয়ে থাকে।



চিত্র: ব্রোকলির জমিতে অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

৫.৩.১০. ফসল সংগ্রহ ও ফলন

সাধারণত ব্রোকলির কেন্দ্রীয় মাথা বা ফুলগুচ্ছটিই তোলা হয়। ফুল ফোটার আগে, যখন শক্ত কুঁড়ি বন্ধ থাকে তখন ব্রোকলি সংগ্রহ করা হয়। তোলার সময় সঠিকভাবে বুঝে ব্রোকলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উপযুক্ত সময়ে তোলা না হলে ফুল ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি ফুলগুচ্ছটির ফুল ফুটতে শুরু করে। জাত অনুযায়ী মাথার ব্যাস ১৫ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার হতে পারে। ব্রোকলির গড় ফলণ প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন।



চিত্র: পরিপক্ক ব্রোকলি

পাঠ সংক্ষেপ

১। ব্রোকলি গাছ ১৫- ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভাল জন্মে।

২। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির অম্লতা ৫.০-৬.৫ ব্রোকলি চাষের জন্য উত্তম।

৩। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপণ করতে হবে।

৪। ব্রোকলি গাঢ় সবুজ রং ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৪. ওলকপি

কপি গোত্রের মধ্যে এক অন্যতম সবজি হল ওলকপি। তবে এটি বাংলাদেশে একটি গৌন সবজি। ফুলকপি কিংবা বাঁধাকপির মত ওলকপি এতটা জনপ্রিয় নয়। ওলকপি কান্ড জাতীয় সবজি এবং বেশ পুষ্টিকর।

১০২৫

অন্যান্য কপির তুলনায় খুব কম সময়ে বেশ ফলন পাওয়া যায় এবং সাধারণ অবস্থায় বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের দেশে সাধারনত দুই ধরণের ওলকপি দেখা যায়। তাঁর একটি হল হালকা বা সাদাটে সবুজ এবং অন্যটি হল বেগুনি সবুজ। অনেকেই ভুল করে ওলকপিকে শালগম বলে থাকে কিন্তু শালগম কিছুটা লালচে রঙের মূল জাতীয় সবজি যা মাটির নিচে হয় (চিত্র)।



চিত্র: ওলকপি



চিত্র: শালগম

৫.৪.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তিস্থল: দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়া ওলকপির উৎপত্তিস্থল।

ইংরেজি নাম: Kohlrabi

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea gongylodes*

গোত্র: Crueiferceae

পুষ্টিমান: পুষ্টিমান হিসেবে ১০০ গ্রাম ওলকপির মাঝে ৬.২ গ্রাম শর্করা, ২.৬ গ্রাম চিনি, ৩.৬ গ্রাম আঁশ, ০.১ গ্রাম চর্বি এবং ১.৭ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে।

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে শীতকালে ওলকপির চাষ করা হয়ে থাকে।

৫.৪.২ জলবায়ু ও মাটি

ওলকপি চাষের জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া দরকার। তাপমাত্রা ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলকপি চাষের জন্য উত্তম।তবে দৈহিক বৃদ্বির জন্য ১৫-২০° সে তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। চাষের জন্য সুনিকাশযুক্ত উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমির উর্বর দোআঁশ ও এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো। মাটির অম্লতা ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ওলকপির জন্য ভাল হয়।

৫.৪.৩ জাত নির্বাচন

আমাদের দেশে বেশ কয়েকধরনের ওলকপির চাষ করা হয়। ওলকপির হালকা সবুজ রঙের জাত আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা এবং বেগুনি রঙের জাত আর্লি পার্পল ভিয়েনা উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: আর্লি পার্পল ভিয়েনা জাত



চিত্র: আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা জাত

৫.৪.৪ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: ওলকপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার চওড়া ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিৎ। সমপরিমান বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে।

চারা উৎপাদন: ওলকপির বীজ ভাদ্র-কার্তিক মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। বীজতলায় বীজ বপনের পর পরিমানমত জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বুনতে হবে। চারায় ৫ থেকে ৬ টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়।



চিত্রঃ ওলকপির চারা

৫.৪.৫ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ওলকপির জমি ৪-৫ টি চাষ দিয়ে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করতে হবে। চাষকৃত জমি মই দিয়ে লেভেলিং করে চারা রোপনের জন্য তেরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ: ওলকপি চাষ করার সময় জমিতে সঠিক নিয়মে সার দিতে হবে। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ওলকপি চাষে জমিতে শতকপ্রতি ৬০ থেকে ৮০ কেজি গোবর সার, ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি

ইউরিয়া সার এবং ৪০০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম এমওপি সার, ৭৫০ গ্রাম জিপসাম সার ও ২০গ্রাম জিংক সালফেট বা দস্তা সার দিতে হবে।



চিত্র: জমিতে ওলকপির চারা রোপণ

চারা রোপণ: সাধারনত ৩০ থেকে ৩৫ দিন বয়সের চারা মূল জমিতে রোপণ করা হয়।চারা রোপণের সময় সারি থেকে সারি ৩০ সে: মি: এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২২ সে: মি: করে লাগাতে হবে। চারা রোপণের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে বা বেঁকে না যায়। এতে চারার মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।

৫.৪.৬ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা ও নিড়ানি: গাছ বড় না হওয়া পর্যন্ত জমির আগাছা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

মালচিং ও গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া: প্রয়োজন অনুসারে জমিতে মালচিং করতে হবে। মালচ হিসেবে খড়কুটা, কচুরিপানা ও পলিথিন ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে যাতে গাছ ঢলে না পড়ে।

পোকামাকড় ও রোগদমন

ওলকপির টোবাকো ক্যাটারপিলার/লেদা পোকা

লক্ষণ

ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে । এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায় । কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে ।

ব্যবস্থাপনা

১। কীড়াসহ গাছ থেকে পাতা ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলতে হবে।

২। ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়। ৩। চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে আলোর ফাঁদ দিতে হবে।

৪। আক্রমণ বেশি হলে স্পর্শ বিষ যেমন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ১০ মিলি হারে মিশিযে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা

কীটনাশক প্রয়োগের ২ সপ্তাহের মধ্যে খাওয়ার জন্য কোন সবজি সংগ্রহ করা যাবে না।

করণীয়

১। আগাম বীজ বপন করা। ২। সুষম সার ব্যবহার করা।

ওলকপির স্ক্যাব রোগ

লক্ষণ

১। এ রোগের আক্রমণে ওলকপির গায়ে এবড়ো থেবড়ো দাগ পড়ে এবং ওলকপির গায়ে গর্তের সৃষ্টি হয়।

ব্যবস্থাপনা

১। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

২। জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার না করা।

৩। জমিতে শতাংশ প্রতি ১৮০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা।

ওলকপির ইয়োলো মোজাইক রোগ

লক্ষণ

১। এ রোগ হলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। অধিক আক্রমণে গাছে মরে যায়।

ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত রাখা।

৩। আক্রান্ত গাছ আপসারণ করা।

সাবধানতা

১। একই জমিতে বার বার ওলকপির চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

করনীয়

১। আগাম বীজ বপন করা।

২। সুষম সার ব্যবহার করা।

ওলকপির পাতার রিং দাগ রোগ

লক্ষণ: এ রোগ হলে পাতায় ছোট ছোট দাগ পড়ে। দাগগুলো পানি ভেজা বলয় দ্বারা আবৃত থাকে । অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায়।



চিত্র: ওলকপির পাতার রিং দাগ রোগ

ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা ।

২। ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখা।

৩। রিডোমিল গোল্ড ১ মিলি. /লি হারে পানিতে শিশিয়ে স্প্রে করা।

সাবধানতাঃ আক্রান্ত জমিতে পুনরায় ওলকপির চাষ করা যাবেনা ।

করণীয়

১। আগাম বীজ বপন করা।

২। সুষম সার ব্যবহার করা ।

৫.৪.৭ সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থাপনা

ওলকপি চাষে প্রচুর পানি লাগে। সারির মাঝের মাটিতে উপরি সার দিয়ে সেই মাটি আলগা করে গাছের গোঁড়ায় টেনে দিলে নালা তৈরি হবে। সেই নালায় সেচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৪.৮ ফসল সংগ্রহ, ফলন ও বাজারজাতকরন

ফসল সংগ্রহ: ওলকপি সঠিক সময়ে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ওলকপি কচি থাকতে তোলা উচিৎ। তা না হলে আঁশ হয়ে যায়, স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারমূল্য কমে যায়।

ফলন: হাইব্রিড জাতের ওলকপিতে হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ৬০ টন ওলকপি পাওয়া যায়।

বাজারজাতকরন: উৎপাদতি ওলকপিগুলো বাজারজাতকরনের জন্য বিশেষ কৌশল নিতে হবে। স্থানীয় বাজারে খুচরাভাবে যত বেশি বিক্রি করা যাবে দাম তত বেশি পাওয়া যাবে, পাইকারিতে বিক্রি করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন মধ্যস্বত্বভোগী বেশি মুনাফা না করতে পারে। যতটা সম্ভব দ্রুত বাজারজাতকরনের ব্যাবস্থা করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলকপি চাষের জন্য উত্তম।

২। মাটির অম্লতা ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ওলকপির জন্য ভাল হয়।

৩। ওলকপি কচি থাকতে তোলা উচিৎ না হলে আঁশ হয়ে যায় ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

এসো নিজে করি

নিচের ছবিগুলো দেখে সবজির নাম লিখ এবং কখন জমি থেকে সংগ্রহ করতে হবে তার পরিপক্কতার মাত্রা উল্লেখ কর।

সবজির নাম	ছবি	পরিপক্কতার মাত্রা
		
		

অনুসন্ধান মুলক প্রশ্ন

তোমার পাশের বাড়ির রহিম চাচা তার ১ বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করতে চায়। এক বিঘা জমি চাষ করতে ৫০০০ চারা দরকার হয়। যদি একটি আদর্শ বীজতলায় (৩ মিটার দীর্ঘ ও ১ মিটার প্রস্থ) ১০০০ চারা উৎপাদন করা যাই তাহলে এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করতে কতটি আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে?

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফুলকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?

২. ফুলকপি চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

৩. কোন ধরনের মাটি ফুলকপি চাষের জন্য উপযোগী?

৪. ফুলকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?

৫. কোন অবস্থায় ফুলকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

৬. বাঁধাকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?

৭. বাঁধাকপির চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

৮. কোন ধরনের মাটি বাঁধাকপি চাষের জন্য উপযোগী?

৯. বাঁধাকপির চারা তৈরির সীড বেডের আকার কত হলে ভালো হয়?

১০. কোন অবস্থায় বাঁধাকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

১১. ব্রোকলির উৎপত্তিস্থল কোথায়?

১২. ব্রোকলির চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

১৩. কোন ধরনের মাটি ব্রোকলি চাষের জন্য উপযোগী?

১৪. ব্রোকলির চারা তৈরির সীড বেডের আকার কত হলে ভালো হয়?

১৫. কোন অবস্থায় ব্রোকলি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

১৬. ওলকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?

১৭. ওলকপি চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

১৮. কোন ধরনের মাটি ওলকপি চাষের জন্য উপযোগী?

১৯. ওলকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?

২০. কোন অবস্থায় ওলকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

২. ফুলকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?

৩. ফুলকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

৪. ফুলকপির ব্লানচিং কি এবং কিভাবে দুর করা যায়?

৫. ফুলকপির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।

৬. ফুলকপিতে বোরনের অভাবে কি ক্ষতি হয়?

৭. প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

৮. বাঁধাকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?

৯. বাঁধাকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

১০. বাঁধাকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?

১১. বাঁধাকপির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।

১২. প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রোকলিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

১৩. ব্রোকলি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?

১৪. ব্রোকলির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

১৫. ব্রোকলি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?

১৬. ব্রোকলির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।

১৭. প্রতি ১০০ গ্রাম ওলকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

১৮. ওলকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?

১৯. ওলকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

২০. ওলকপি ও শালগম চেনার উপায় কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ফুলকপির চারা উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ফুলকপির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

৩। ফুলকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। কপি জাতীয় ফসল চাষে রোগ আক্রমনের পূর্বে করনীয় কি কি?

৫। বাঁধাকপির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। বাঁধাকপির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

৭। বাঁধাকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। ব্রোকলির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। ব্রোকলির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

১০। ব্রোকলির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১। ওলকপির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। ওলকপি চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

১৩। ওলকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

জব ৫.১: ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির বীজতলা এবং সুস্থ ও সবল চারা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখন ফল

১। বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে পারবে।

২। বীজতলার মাটি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। বীজতলায় বীজ বপন করতে পারবে।

৪। বীজতলার পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। সুস্থ ও সবল চারা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলার স্থান প্রস্তুত করা ;

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা ;

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা ;

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা ;

৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা ;

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি

৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রোকোলি অন্যতম। বর্তমানে আগাম চাষের জন্য চারা উৎপাদন বেশ প্রসার লাভ করেছে। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।শুরুতেই বীজতলার স্থান নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া উচিত যেন বৃষ্টির বা বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা যায়। ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে বীজতলা করা প্রয়োজন। পানির উৎসের কাছাকাছি বাড়ি, খামার বা অফিসের কাছাকাছি হলে ভালো হয়। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলা যতদূর সম্ভব ক্রেতাদের কাছাকাছি এবং ভালো যোগাযোগ সম্পন্ন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব সার, ৪। বীজ, ৫। বালি, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি/চাঁটাই, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। ইটের গুড়া, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির বীজতলার জন্য অবশ্যই অবশ্যই ছায়া মুক্ত উচু যায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরীর জন্য ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া করে একটি আয়তকার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।

৩। এবার এর ৪ কোণায় ৪টি খুঁটি পুঁতে চার দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তারপর কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সে: মি: গভীর করে মাটি খুড়ে তুলে ফেলতে হবে এবংনিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরে বীজতলাকে সাজাতে হবেঃ

ক) সর্বনিম্ন স্তর: প্রায় ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি পুরাতন সুরকি , ভাংগা ইট, পোড়া মাটি ইত্যাদি।

খ) মধ্য স্তর: ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি দোঁ-য়াশ মাটি ও বালুর মিশ্রণ।

গ) উচ্চ স্তর: ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি বেলে-দোঁয়াশ মাটি , পঁচা গোবর ও কম্পোষ্ট সারের মিশ্রন।

৪। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য সাদা উজ্জল পলিথিন দিয়ে বীজতলা ৩-৪ সপ্তাহ ভালোভাবে বায়ু রোধ করে ঢেকে রাখতে হবে। সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে ভেতরের জীবাণু মারা যাবে।

৫। শীতকালের জন্য বীজতলা সামান্য (৪-৫ সেঃমিঃ) উচু এবং বর্ষাকালে একটু বেশি (৮-১০ সেঃমিঃ) উচু করে প্রস্তুত করতে হবে।

৬। বীজতলায় রাসায়নিক সার মোটেও দেয়া যাবে না। তবে জৈব সার বীজতলায় ২-৩ কেজি হারে প্রয়োগ করা উত্তম। এর সাথে ২০-৩০ গ্রাম কার্বোফুরান দিতে হবে।

৭। বীজতলায় বপনের পুর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৮। বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালি বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়।

৮। বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৯। বাঁশের ফালি দিয়ে বীজতলার উপর ধনুকের মতো বাকিয়ে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর সাদা পলিথিন দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হয়।



চিত্র: সাদা পলিথিনে ঢাকা বীজতলা

১০। চারা গাছে ৫-৬ টি পাতা বের হলেই তা রোপনের উপযুক্ত হয়। ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০ দিন বয়সের সুস্থ ও সবল চারা নির্বাচন করতে হবে।

সতর্কতা

১। বীজতলার জন্য ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবেনা।

২। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। বীজ বপনের সাথে সাথে বীজতলায় সেচ দেয়া যাবেনা।

জব ৫.২: ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির উৎপাদন কৌশলের দক্ষতা অর্জন

শিখন ফল

১। উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবে।

২। জমি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। মূল জমিতে চারা লাগাতে পারবে।

৪। ফসলের পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। পরিপক্কতার মানদণ্ড অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদণ্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা ;

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা ;

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা ;

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা ;

৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা ;

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজিসমূহ যেমনঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ও ব্রোকলি আমাদের দেশে শীতের জনপ্রিয় সবজি। তবে শীতের সবজি হলেও এখন গ্রীষ্মকালেও উৎপাদিত হচ্ছে। এই সবজিগুলুতে যথেষ্ট পরিমাণে সালফার, পটাশিয়াম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এই ধরনের সবজিসমূহ চাষের জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উপযোগী। সুনিস্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এঁটেল মাটি সমৃদ্ধ উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা এই ধরনের সবজি চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৬.৫ ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজি চাষের জন্য উত্তম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। সুস্থ ও সবল চারা, ৫।মই, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। জৈব বালাইনাশক, ১৩। পলিথিন, ১৪। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জমি নির্বাচন করতে হবে।

২। ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

৩। সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়মঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১.০-১.২ কেজি	২৫০-৩০০ কেজি
টি এস পি	০.৬-০.৮ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.০ কেজি	২০০-২৫০ কেজি
বোরাক্স	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৬০-৮০ কেজি	১৫-২০ টন

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর।

৪। চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট।

৫। রোপণের প্রথম কয়েক দিন প্রখর রোদে যাতে চারা ঝিমিয়ে না যায় তার জন্য কাগজ বা কলার খোল দিয়ে ছায়া দিতে হবে।

৬। সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে।

৭। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৮। গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়।

৯। ফুলকপির ক্ষেত্রে ফুল সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থায় চারদিক থেকে পাতা টেনে বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে।

১০। পরিপক্কতার মাত্রা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতা

১। ছায়া যুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবেনা।

২। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। অতিরিক্ত পরিপক্ক করে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা।

সমাপ্ত

২০২৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।